চতুর্থ অধ্যায়

রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্প : সমাজ, সময় ও চরিত্রের বহুমাত্রিকতা

যে কোন সৃষ্টিশীল রচনা সে উপন্যাস হোক কিংবা ছোটগল্প তার প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্যই কাহিনি বা বিষয় এবং সেই কাহিনির মধ্য দিয়ে চরিত্রের সঞ্চরণশীলতা। একটি রচনা তখনই সার্থক শিল্পে পরিণত হয় যখন তার বিষয় ও অবয়ব যথাযথভাবে রূপায়িত হয়। আর সেই বিষয় ও চরিত্র লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতারই ফসল। সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে—

> "... ছোটগল্প হল লেখকের ব্যক্তিত্বেরই এক একটি অভিব্যক্তি। নিজের সমাজ পরিবেশ, শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং চারিত্রিক গঠন অনুযায়ী ছোটগল্পের লেখক যে প্রতীতি জীবন থেকে গ্রহণ করবেন, তারাই তাঁর রচনায় ধরা দেবে। ছোটগল্প লেখকের ব্যক্তিত্বেরই বিচিত্র রঞ্জিত বিকাশ।"[১]

রমাপদ চৌধুরীর রচনার মধ্যেও সেই একই জিনিস লক্ষ করা যায়। লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের নানান অভিজ্ঞতা নানা রূপে বিভিন্ন গল্পের পটভূমি রূপে উঠে এসেছে। গল্প লেখার মূলে তাঁর যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে তা হল তাঁর ভারতভ্রমণের পুঁজি, প্রসঙ্গকথায় তিনি নিজেই তা উল্লেখ করেছেন—

> "...এতখানি বিশ্বাসের মূলে ছিল আমার ভারতভ্রমণের পুঁজি। কত অভিজ্ঞতা, কত মজার মজার গল্প। বাবা ছিলেন ভ্রমণবিলাসী, তাই সারা ভারত ঘুরে নিয়েছি স্কুল জীবনেই।"[২]

রমাপদ-র লেখা ছোটগল্পগুলোকে নিবিড়ভাবে পাঠ করলে দেখা যায় যে, গল্পগুলিতে বিচিত্র বিষয়ের প্রাধান্য রয়েছে এবং এর মধ্যে দিয়েই চরিত্রের যথাযথ উপস্থাপনায় সেই সমাজ ও সময়ের জটিলতা, দ্বান্দ্বিক পরিসর এবং উত্তরণের সম্ভাবনাময় উপস্থিতির চিত্র নিঁখুতভাবে বর্ণিত হয়েছে লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞানে। সহজ সাবলীল বর্ণনারীতি বা কথনরীতির সাহায্যে গল্পের আবহ ও ব্যঞ্জনা সরাসরি পাঠকের অন্তঃকরণে পৌঁছে পাঠকের মনের জিজ্ঞাসাকে উস্‌কে দেয়,

পাশাপাশি অনেক অজানা বিষয় বা জগত, নিত্যদিনকার পরিচিত জগতের অপরিচিত রূপের জানান দেয়। তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং জীবন সম্পর্কিত সূক্ষ্ম অভিজ্ঞান নানা অনভূতি ও ব্যঞ্জনায় ধরা দেয় ছোটগল্পের পরতে পরতে, গল্পের আবহকে বিশ্বজনীনতায় উত্তরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে।

।। এক।।

রমাপদ চৌধুরীর গল্পসমগ্রের প্রথম গল্প 'উদয়াস্ত', 'যুগান্তর' সাময়িকীতে প্রকাশিত হয় ১৩৫০ সালে।গ্রন্থাকারে 'কথাকলি' গ্রন্থে প্রকাশিত হয় ১৩৬৬-তে। 'উদয়াস্ত' গল্পটি এক দম্পতির বিশ বছরের দাম্পত্যজীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। নিতান্ত সাধারণ এক গল্প। গল্পের পটভূমি রেলস্টেশন, যা লেখকের চিরপরিচিত এক জগত। যে সময়ের প্রেক্ষিতে গল্পটি রচিত হয়েছে, সে এক সার্বিক দোলাচলতার সময়। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী মন্বন্তর এবং এর পরবর্তীতে যন্ত্রসভ্যতার আগমন — এমন অবস্থানে মানুষের আশা, স্বপ্ন যে প্রতিদিনকার যাপিত জীবনে পিষ্ট হতে চলেছে তা যেন বলার অপেক্ষা রাখে না। এ গল্পের 'গল্পহীন সারল্য' গল্পটিতে এক ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করেছে। স্টেশনমাস্টার বিষ্ণুরামের জীবনে অন্যান্যদের উপস্থিতি থাকলেও প্রকৃত সঙ্গী কেউই ছিল না। কর্মক্ষেত্র এ.এস.এম মালবাবু আর চেকারবাবু এবং পারিবারিক জীবনে স্ত্রী, দুই পুত্র এবং এক কন্যা। সকাল সকাল চা খেয়ে এ.এস.এম শিবুবাবুকে রিলিফ দেওয়ার জন্য তার তাড়া থাকে বাড়ি ফিরে এসে ক্লান্তিতে গা এলিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। এর মধ্যে কোথাও যেন এতটুকু পরিবর্তন নেই। স্ত্রী সাবিত্রীকে আদর করে 'সাবু' বলে ডাকলেও তার সঙ্গে গৃহস্থালির কথাবার্তা ছাড়া আর কোন খোঁজই রাখে না বিষ্ণুরাম। সাবিত্রীর মনের কথা জানা তো দূরের কথা চা ছাকার ছাঁকনি আনার কথা বললেও তা তার মনে থাকে না বা তার স্বভাবসুলভ মধ্যবিত্ত মানসিকতা গার্ডকে দিয়ে ছাঁকনি আনার কথা সে ভাবতেই পারে না, কারণ —

> ''ওসব লোককে বিশ্বাস নেই — ছোটলোক ক্লাস, পাঁচ আনায়
> কিনে বলবে, ছ আনা — আবার পুজোর সময় বকশিস চাইবে।''[৩]

অন্যদিকে সাবিত্রীও ঘরকন্যার কাজে সদা ব্যস্ত। ছেলেমেয়েকে মানুষ করা, বিষ্ণুরামের

প্রয়োজনীয়তার যোগান দেওয়া — এসব নিত্যনৈমিত্তিক কাজের একঘেয়েমিতে সে নিজেও ক্লান্ত। রাতভর ঘুমোতে না পেলেও ভোর চারটেতে তাকে চা করে দিতে হয়। প্রতিদিনের যাপিত জীবন যেন যন্ত্রের মতো তাকে চালিত করে।

স্টেশনমাস্টারের 'টরে টক্কা' থেকে একটু শান্তি লাভের আশায় কোয়ার্টারে আসে বিষ্ণুরাম। সাবিত্রী হাত পাখা খুঁজতে গিয়ে দেখে ছেলে গোরা সেই হাতপাখা উনুনে গুঁজে তা দিয়ে কয়লা তোলার চেষ্টা করছে, এতে সাবিত্রী রাগান্বিত হলে বিষ্ণুরাম কোন কথা না বলে গোরার হাত থেকে পাখাটা কেড়ে নিয়ে কয়েক ঘা বসিয়ে এবং নিজেকে একটু হালকা করার জন্য শিবুর আড্ডায় যোগ দিতে বেরিয়ে পড়ে। এদিকে গভীর রাত পর্যন্ত অধীর অপেক্ষায় বসে থাকে সাবিত্রী, দরজায় কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দেয়। বিষ্ণুরাম সাবিত্রীর স্নেহ প্রেম ভরা মুখখানি ঘুরিয়ে দেয় নিজের মুখের দিকে। মুহূর্তের জন্য স্বামীর আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে পরক্ষণেই নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়। বিষ্ণুরামের মুখে ফুটে ওঠে ম্লান হাসি। সে অনুভব করে —

> ''দোষ কারও নয়, দোষ তার বয়সের। আজ তাই ছেলেরা তাকে
> মানে না, তার প্রতি সাবিত্রীর আর কোনও আকর্ষণ নেই।"[৪]

তার স্মৃতিতে ভেসে ওঠে যৌবনের মধুময় দিনগুলি। যে দিনগুলোতে সাবিত্রী চিঠি লিখত — ''চিঠির শেষে তুমি যা চেয়েছ, তা কি চিঠিতে দেওয়া যায়, একদিন এখানে এসে নিয়ে যেয়ো।"[৫] বিষ্ণুরাম ভাবে সেই জীবন আর এই জীবনের মধ্যে কত পার্থক্য। সেই সাবিত্রী ও আজকের সাবিত্রীর মধ্যেও অনেক তফাৎ। আসলে সময় যে দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে তা বিষ্ণুরাম অনুভব করতে পারে। তাই তার মনে হয় সংসার অপেক্ষা স্টেশনঘরের 'টরে টক্কা'-ই অনেক ভালো।

গল্প সমগ্রের দ্বিতীয় গল্প 'রত্নকূট'। 'রত্নকূট' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'পূর্বাশা' পত্রিকায় ১৩৫২ সালে। পরবর্তীতে 'স্বর্ণমারীচ' গ্রন্থে প্রকাশিত হয় ১৩৫৭ সালে। গল্পটি একটি আয়রণ কারখানাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। পাঁচিল ঘেরা এই বিরাট কারখানা হাজার হাজার মানুষের অন্ন সংস্থানের স্থল। ঘণ্টায় সতেরোটি ওয়াগন মাল বোঝাই করে সাইজিং স্লিপার পিষে নানাদিকে সরে যায়। মিনিটে মেশিন ঘরে সাতশ নাটবল্টু তৈরি হয়। আঠারোজন অ্যাকাউন্ট ক্লার্ক এখানে

কাজ করে। মোহনলাল 'সৌদামিনি আয়রণ ওয়ার্কস'-এর একজন একক অধিপতি। মোহনলালের দুই মেয়ে। বড়ো মেয়ে অবন্তী বিবাহিতা। জামাইয়ের দেশী বিদেশী ডিগ্রি আছে অনেক। ছোটো মেয়ে অলকা ফ্রকের পাড় নাচিয়ে বিনুনী দুলিয়ে নিজের ইচ্ছেমত নেচে বেড়ায়, ছেলে শোভন বিলেতে থাকে। এরকম পারিবারিক পারিপার্শ্বিক পরিসীমানার মধ্য দিয়েই মোহনলালের জীবন অতিবাহিত হয়। কথাকার রমাপদ চৌধুরী এই চরিত্রের মধ্য দিয়ে সমাজের একশ্রেণির মানুষের ছবি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন, যারা উদারতার স্বমহিমায় উজ্জ্বল এবং এই উদারতাকে ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে চান নি, অর্থাৎ নিচুস্তরে কর্মরত ব্যক্তির পদোন্নতিতে আগ্রহী হলেও অমলেন্দু হাজরার মত ব্যক্তিদের পারিবারিক জীবন বন্ধনে বাঁধতে নারাজ। কারণ—

> "... সমাজে তাঁর আসন যে অনেক উঁচুতে সে সম্বন্ধে সদা সচেতন তিনি। জানেন অমলেন্দুর মতো ছেলেদের মানুষ করে তুলতে বড় ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু কাছে টেনে আনা যায় না।"[৬]

তা সত্ত্বেও মোহনলালের সস্নেহ প্রশ্রয় ও ভালোবাসায় অমলেন্দু নিজের মনেও আশার বীজ বপন করে চলে। এই বীজ আরেকটু মহীরুহে পরিণত হয় স্যার মোহনলালের কাছ থেকে তার ছোটো মেয়ের জন্মদিনের নেমন্তন্ন পাওয়ার পর। অমলেন্দুর মনে এক অদ্ভুত আনন্দ কাজ করে — অলকা, কারখানা, বিরাট সৌধ, হুকুম মান্যরত হাজারো শ্রমিক, গ্যাস ফারনেস, ক্রেন, ট্রলি, বয়লার টিউবের সারি, জয়েন্ট অ্যাঙ্গলের স্তূপ — সবমিলিয়ে এক বিরাট আভিজাত্যপূর্ণ জীবনযাত্রা। সেজন্যেই মামার বাড়িতে নেমন্তন্ন থাকা সত্ত্বেও সেখানে না গিয়ে অমলেন্দু মোহনলালের বাড়িতে যথাসময়ে পৌঁছয়। হলঘরে স্টেজ বাঁধা হয়েছে। হাজার বাতির আলোয় অমলেন্দুর চোখে ধাঁধার সৃষ্টি হয়। চীনে লণ্ঠনের বর্ণবৈচিত্র্যে অমলেন্দুর মন আনন্দে উদার হয়ে উঠে। একদিকে জ্যোৎস্না আর বৈদ্যুতিক আলোয় অনেক তরুণীর রঙ বেরঙের শাড়ির চাকচিক্য যেন সুসজ্জিত ঘরে রামধনু ফেটে পড়ছে। অলকাকে কিউরিও থেকে গজদন্তের ওপর কাজ করা একটা মূর্তি উপহার দেয় অমলেন্দু। কিন্তু তার এই রাজত্বের স্বর্ণসৌধ দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। এক ধাক্কায় তা চুরমার হয়ে যায়, যখন মোহনলাল বলেন —

> ‘‘. . . এ.এফের পোস্টটা খালি হল। ইচ্ছা ছিল তোমাকে দেব, কিন্তু ভেবে দেখলাম অন্য সবাই হয়তো ক্ষুণ্ণ হবে সিনিয়র ক্যান্ডিডেটদের চান্স না দিয়ে তোমাকে দিলে . . . তাই তোমারও আত্মসম্মানে যাতে না লাগে, তাই বাইরের থেকে একটি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছোকরাকে আনাচ্ছি। . . . হ্যাঁ, আর একটা কথা। . . . অলকার বিয়ে এই দিন বিশেকের মধ্যে। . . . হবু জামাইটিকে সঙ্গে করে বিয়ের বাজার করতে হবে তোমাকে। . . . বিয়ের তত্ত্বটা তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে।’’[৭]

অর্থনৈতিক ক্ষমতাই সমাজে মানুষকে বলীয়ান করে তোলে বা বলা যায় আর্থিক ক্ষমতাই শ্রেণি বৈষম্যের জন্মদাতা। তাই অমলেন্দুর চাকুরিতে পদোন্নতি যেমন সহজে হয় না, তেমনি তার থেকে উঁচুস্তরের ব্যক্তির জামাই হওয়ার বাসনাও যেন ধুলোয় পর্যবসিত হয়।

উল্লেখ্য, ‘উদয়াস্ত’ গল্পের বিষ্ণুরামের মতোই ‘রত্নকূট’ গল্পের মোহনলালও নিঃসঙ্গ। ছোটো মেয়ে অলকার জন্মের কয়েকমাসের মধ্যেই স্ত্রী মহালক্ষ্মী মারা যান। মহালক্ষ্মীর আসনে অন্য কাউকে না বসালেও তার সারাজীবন ধরে এক অপরিসীম শূন্যতা কাজ করে। একা মনে হয় নিজেকে, ফুলের মতো নরম বিছানা, তবুও যেন অস্বস্তি লাগে। মাঝে মাঝে তার মনে হয় মহালক্ষ্মীর আসনটা অন্য কাউকে না দিয়ে জীবনটা ব্যর্থ করে তুলেছেন। আবার ছেলেমেয়ের মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠলে এক অপরিসীম লজ্জাবোধ তাকে গ্রাস করে। তাই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের চারদিকে মোটর বিহার করে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ চোখ পড়ে একটি বাড়ির দিকে। দোতলার জানালায় রাখা হারিকেন লণ্ঠনের মিটমিট আলোয় তিন চারটি মেয়ে রঙিন শাড়ি, চোখের কোণে কাজল, নরম হাতে কয়েকগাছি কেমিকেল সোনার চুড়ি পড়ে অপেক্ষারত অভিসারিকার মত প্রহর গুণছে। তারই মধ্যে আঠারো বছরের সোহাগীর দিকে চোখ যায় মোহনলালের, সোহাগী হাত নেড়ে মোহনলালকে আহ্বান জানায়। মোহনলাল সোহাগীর ডাকে সাড়া দিয়ে পা বাড়ালে বাধাপ্রাপ্ত হন ড্রাইভার বাহাদুরের আওয়াজে ‘‘সাহাববাবু, কাঁহা যাতে হেঁ সাহাববাবু।’’[৮] সঙ্গে

সঙ্গে সম্বিৎ ফিরে আসে এবং একটা আত্মধিক্কার জন্ম নেয় —

> "... অবন্তী, অলকা, ছি, ছি, অলকা যদি কোনওরকম জানতে পারে এ কথা, ... ভাগ্যিস বাহাদুর ডাক দিলে। নাঃ, লোকটাকে কিছু বকশিস দিতে হবে, মুখটাও বন্ধ করা যাবে সেই তালে।... ও পথে আর কোনদিন যাবেন না।"[৯]

'উদয়াস্ত'-র বিষ্ণুরামকে সাবিত্রী ফিরিয়ে দিলে বিষ্ণুরাম নিজের একাকীত্বকে মেনে নেয়, বিকল্প পথের সন্ধান করেনি। এখানে মোহনলাল ব্যতিক্রমী। একাকীত্বকে আর বেশি ধরে রাখতে পারেন নি। এক সময় নিজের কাছে নিজের প্রতিশ্রুতি হার মানে। তাই গল্পের শেষে দেখা গেল যে নিজের নাতনীর আয়া পাহাড়ী মেয়ে কাঞ্চনীর দিকে এগিয়ে গেলেন। আর তাই তার স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহ, ঘুমের ঘোরে আবরণমুক্ত বুক লুব্ধ চোখে নেশা ধরিয়ে দেয়, চোখ ফেরানো সম্ভব হয় না। যে অহঙ্কার আর শ্রেণি গর্বে একসময় অমলেন্দুকে কাছে টানা সম্ভব হয় নি, পাহাড়ী মেয়ে কাঞ্চনীর কাছে নিজের অতৃপ্ত হৃদয়ের বাসনা চরিতার্থ করার মধ্য দিয়ে সেই আত্মগর্ব এবং অহঙ্কার চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। আসলে সময়ের দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ মানসের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এই পরিবর্তনকেই কথাকার সুন্দরভাবে 'রত্নকূট' গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন।

পারিবারিক জীবনের বৈষম্য ও সমস্যাকেন্দ্রিক বিষয়ের বাইরেও রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্পের জগৎ বিস্তৃত ছিল। স্থানীয় অতীতের লোক ঐতিহ্য থেকে তিনি লিখলেন 'দরবারী' গল্প। যদিও গল্পের ভূমিকাতেই তিনি উল্লেখ করেছেন "গল্পের সব চরিত্র ও ঘটনা কাল্পনিক, পরিবেশ ও স্থান নামটাই সত্য।"[১০] বস্তুত গল্পের ভূমিকা অংশে লেখকের এই স্বীকারোক্তি স্থানিক মাত্রাকে তাৎপর্যবহ করে তুলতে সাহায্য করে। যাই হোক, 'সূচিপত্র' মাসিক পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ পেল 'দরবারী'। গল্পটি ইংরেজিতেও অনুবাদ হয়। অনুবাদ করেন অবু ঘটক। গল্পটি প্রথম গ্রন্থাকারে পরকাশিত হয় ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে।

'দরবারী' গল্পটি 'লাপরা' নামক একটি ছোট্ট রেলস্টেশনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। স্টেশন মাস্টার রজনীবাবু এবং কর্মচারী কিষণলাল। সেই কিষণলাল যে কার কর্মচারী বলা কঠিন।

কারণ, সিগন্যাল পোস্টের সিঁড়িতে উঠে আলো জ্বালানো থেকে শুরু করে ট্রেনের সময় ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজানো, 'পানিপাঁড়ে' ডাক শুনলে দেহাতী যাত্রীদেরকে জল দেওয়া, রজনীবাবুর কোয়ার্টারে মশলা বাটা—এসমস্তই তার নিত্যদিনকার কর্ম। এমনই পরিবেশে একদিন পদার্পণ ঘটে সাহেব জোনাথন ম্যাক ক্লাস্কি। ক্রমে সাহেব জোরাথন ম্যাকক্ল্যাস্কি মুণ্ডাদের সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং মুণ্ডাদের সামাজিকতার সঙ্গে নিজেকে জড়িত করতে চায়। এখানেই গল্পটি একটি নতুন মোড় নেয়। জোনাথন ম্যাক্ক্লাস্কি মুণ্ডা মেয়ে শোনিয়াকে বিয়ে করে নিজে মুণ্ডাশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হতে চেয়েছিল, মুণ্ডা সমাজের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে চেয়েছিল। গল্পের নিতান্তপ্রয়োজনেই সেখানে রেভারেন্ড ব্রাউন, মিসেস ক্যাসল, ফ্লোরার আগমন ঘটে। আর তাই আদিবাসী মুণ্ডাদের 'মাণ্ডা পরব' দেখে ফেরার পথে মুণ্ডাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান যা কি না রেভারেন্ড ব্রাউনের দৃষ্টিতে কু-সংস্কার ছাড়া কিছু না, তাই তিনি তাদের শিক্ষিত করে আলোর মাঝখানে আনতে চান—

> "... আই মাস্ট ব্রিং লাইট টু দেম। এইসব অশিক্ষিত হিদেনদের
> অন্ধকার থেকে আলোকে আনতে চাই আমি।"[১১]

ক্রমশ লাপরা বাহ্যিক আলোয় আলোকিত হয় ঠিকই, কিন্তু সত্যিই কী আলোকিত হয়েছিল? এ প্রশ্ন যেন থেকেই যায়। দেখতে দেখতেই বছর কয়েকের মধ্যেই লাপরার দেহাতী অঞ্চল অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কলোনিতে পরিণত হয়। গির্জা, মিশনারী স্কুল প্রতিষ্ঠা, ইনস্টিটিউট, রেস্ট হাউস, দোকানপাট, কলোনী অফিস, মন্দির, মদের দোকান, সাহেবদের অবসর জীবন কাটাবার জায়গা হিসেবে পরিগণিত হল লাপরা। মুণ্ডারা সকলে হয়ে গেল খ্রিস্টান। কিন্তু মুণ্ডাদের খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করানো জোনাথন ম্যাক্ক্ল্যাস্কির উদ্দেশ্য ছিল না। এখানেই এই চরিত্রের চরমতম ট্র্যাজিডি লক্ষ করা যায়—

> "... হামারা মিশন বরবাদ হো গিয়া রাজনীবাবু। ... হামারা মিশন
> তো এ নাহি থা রাজনীবাবু। আই অ্যাডমায়ার দি মুণ্ডাজ সোস্যাল
> সিস্টেম। হাম ভি মুণ্ডা হোনে মাংতা থা। ... আই হ্যাভ বিন

ডিফিটেড। আউর হামারা কলোনী পিপ্‌ল ভি ইন্ডিয়ান নাহি হুয়া। দে হ্যাভ জাস্ট ইমপোর্টেড এ ব্রিটিশ ভিলেজ হিয়ার ইন ইন্ডিয়া।”[১২]

মুণ্ডারা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে এতে যেমন জোনাথন ম্যাকক্ল্যাস্কি ব্যথা অনুভব করে, তেমনি তীব্র অন্তর্দহনে জর্জরিত হয় যখন তার ছেলে ম্যাক প্রণয়িনীকে না পাওয়ার ব্যর্থতার জন্য মুণ্ডা মা শোনিয়াকে দায়ী করে। লেখক জোনাথন ম্যাকক্ল্যাস্কির মধ্যে আদিবাসি মুণ্ডাদের প্রতি আনুগত্য ফুটিয়ে তুলেছেন, পাশাপাশি রেডারেন্ড ব্রাউনের মতো চরিত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন হিংস্র ক্রুসেডারদের অভিযান। যে অভিযানে রেভারেন্ড ব্রাউনের হাত লাল হয়ে ওঠে জোনাথন ম্যাকক্ল্যাস্কি আর তার স্ত্রী শোনিয়ার রক্তে। যদিও তা যবনিকার অন্তরালে চাপা পড়ে যায়, বড়ো হয়ে ওঠে প্রভু যীশুর ক্ষমা এবং অহিংসা। গল্পটির চরিত্র ও ঘটনা আপাত অর্থে কাল্পনিক মনে হলেও বিষয় বৈচিত্র্যে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সহজেই। সেইসঙ্গে গল্পের আখ্যানের মধ্য দিয়ে যেন স্থানীয় একটি মিথ তৈরি হল পাঠকের মনে। প্রসঙ্গক্রমে সমালোচকের মন্তব্য ধার করে বলা যায়—

“... রমাপদর গল্পের ঘটনার চেয়ে বড় হয়ে ওঠে ঘটনার তাৎপর্য, তাই একটি ব্যক্তিগত প্রণয়োপাখ্যান তথা স্থানীয় মিথ-এর মধ্যে একদিকে যেমন অনায়াসে জীবন্ত হয়ে ওঠে যীশুর ক্ষমা আর অহিংসার ধর্মপ্রচারের জন্য ক্রুসেডারদের যুগান্তব্যাপী হিংস্র অভিযান অন্যদিকে তেমনি অদৃশ্য অক্ষরে লেখা হয়ে যায় দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব মিলনের অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক দলিল।”[১৩]

‘দরবারী’ গল্পের মতোই লোক পরম্পরার ইতিবৃত্তের পরিচয় পাই ‘রেবেকা সোরেনের কবর’ গল্পে। গল্পটি প্রথমে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৬৪ সালে ‘আপন প্রিয়’ গ্রন্থে। রূপমতী ও ম্যাকু ফার্নহোয়াইটের ব্যর্থ প্রণয় কাহিনি এই গল্পের মূল বিষয়বস্তু রূপমতী খাদামে কাজ করে এবং তার স্বভাব সুলভ সহজতায় স্বপ্ন দেখে লালুয়া কড়ুখকে নিয়ে, ম্যাকু ফার্নহোয়াইটের সঙ্গে কথা বলে। রূপমতীর ম্যাকু ফার্নহোয়াইটের সঙ্গে মেলামেশাকে

সান্তালরা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারে না। তাদের বক্তব্য—

> ''সাহেব। ও হল আমাদের শত্রুর জাত। চান্দো বোঙা পাপের জল ছিটিয়ে দিয়েছে ওদের ওপর। ধরম নাই ওদের, তাই সান্তালদের ধরম নষ্ট করতে এসেছে ওরা। চান্দো বোঙার কাছে থেকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে খ্রিস্টান করে দেয় ওরা।''[১৪]

এখানে একদিকে সান্তালদের নিজেদের ধর্মের প্রতি যেমন টান অনুভব করে, তেমনি বিধর্মী সাহেবদের প্রতিও বিরূপ মনোভাব পোষণ করে। কিন্তু সরাসরি সাহেবদের কোন কথা বলতে সাহস পায় না। রূপমতীও বুঝে উঠতে পারে না, লালুয়া কুড়ুখের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে ওরা কোন কথা বলে না, অথচ ''লালুয়া কুড়ুখও বেজাত, কিল্লির মিল নেই। তবু তাকে নিয়ে রটনার মৌমাছি গুণগুণ করে না। যত আপত্তি ম্যাকুসাহেবের বেলা।''[১৫]

সান্তালদের মধ্যে একধরনের শাস্তি প্রচলিত ছিল, যার নাম 'বিটলা'। এর অর্থ কোন মেয়ে যদি (তাদের কথায়) খারাপ কাজ করে বা তার নামে কুৎসার রটনা হয় তাহলে পঞ্চায়েত শাস্তিস্বরূপ প্রদান করবে 'বিটলা'। 'বিটলা' হওয়া মানে গোটা পরিবারকে সমাজ চ্যুত করা, অশ্লীল গালি গালাজ, শারীরিক নির্যাতনের শিকার হওয়া। তাই রূপমতী নিজের কুৎসা রটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভাবে লালুয়াকে সঙ্গে নিয়ে—

> ''দু কুড়ি টাকা জমলেই চলে যাবে কুমান্ডির খাদানে। দুজনে বাসা বাঁধবে সেখানে। বিটলার ভয়ে কাঁপতে হবে না।''[১৬]

কিন্তু দেখা গেল রামলীলার মাঠে ভিখারিয়ারা রূপমতীর কুৎসাকে নিয়ে গান বাধে তখন দেখা দেয় দাঙ্গা। শেষপর্যন্ত নিজের প্রাণ বাঁচাতে ম্যাকু ফার্নহোয়াইটের হাত ধরে রূপমতী রাতের অন্ধকারে তার ডেরায় হাজির হয়। ফলস্বরূপ, তাকেও পঞ্চায়েত শাস্তি প্রদান করে 'বিটলা' হওয়ার—

> ''... সারা গাঁয়ের ছেলে ছোকরারা দলে দলে বাঁশি আর মাদল বাজিয়ে নাচতে নাচতে ঘিরে ফেলল রূপমতীকে। ... কেউ তীরের খোঁচা দিল, কেউ টানল শাড়ির আঁচল। ... দু হাত তুলে

চিৎকার করতে করতে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে রূপমতীর গায়ে। এদিকে বাঁশ পোতা হল রূপমতীর ডেরার সামনে। পোড়া কাঠ, পুরোনো ঝাঁটা, আর ভাত খাবার পর ফেলে দেওয়া শালপাতা গেঁথে দেওয়া হল বাঁশের ডগায়। কেউ উনুন ভাঙল, কেউ হাঁড়ি কড়াই টুকরো টুকরো করল।"[১৭]

এরকম চূড়ান্ত অবমাননার মুহূর্তে ম্যাকু সাহেব তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় এবং রূপমতীকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু এখানে লালুয়া কড়ুখের প্রতি ভালোবাসা তাকে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত করে—

"খাদানের কাজের ফাঁকে হাসি দিল্লাগী এক জিনিস, আর তার বাংলোয় রাত কাটানো অন্য। পীরিতি ওর লালুয়া কড়ুখের সঙ্গে। ঠিগিয়া হবে দু কুড়ি টাকা জমলেই। তা নয়, ম্যাকুসাহেব হাসতে হাসতে বলে কিনা রূপমতীকে শাদি করবে।"[১৮]

রূপমতী চরিত্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বিশ্বাসের দৃঢ়তা। ম্যাকু সাহেব তাকে রূপমতী থেকে রেবেকায় উত্তরণ ঘটায় ঠিকই, কিন্তু শেষপর্যন্ত বিয়ে না করে ফিরে আমার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে কারানপুর ত্যাগ করে চলে গেলেও এক অদ্ভুত দৃঢ়তা তার মধ্যে কাজ করে। তাই ফার্নহোয়াইটের জায়গায় মিস্টার পেরেরা এসে চৌকিদারের ঘর থেকে রূপমতীকে তাড়িয়ে দেওয়ার কথা বললে সে তার টুকটুকে বাচ্চাকে বুকে আঁকড়ে চোখ রাঙিয়ে বলে ওঠে "... কে জানিস আমি? ম্যাকু সাহেব আমার হাসবাঁধ।"[১৯] আবার সোনামিরু রূপমতীকে খাদানে কাজ করার পরামর্শ দিলে ম্যাকু সাহেবের প্রতি সম্মান ও অগাধ বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি হয় অপ্রকৃতিস্থ রূপমতীর কণ্ঠে—

"খাদানের কাম? ... আমার না ম্যাকুসায়েবের সাথে বিয়া হইছে। ম্যাকুসায়েবের ইজ্জত খতম করতে চাস তুরা? ... ম্যাকুসায়েব মানুষটারে তুরা বুঝিস নাই বটে। ও আমারে কয়ে যেছে ফির‍্যা আসবে।"[২০]

পাশাপাশি ম্যাকু সাহেব চরিত্রটির মধ্যে কাজ করে এক বিরাট অন্তর্দ্বন্দ্ব। যদিও তার এই অন্তদ্বন্দ্ব বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। একদিকে সান্তাল মেয়ে রূপমতীর টান অন্যদিকে সিলভিয়ার আকর্ষণ— এই দু'য়ের টানাপোড়নে শেষপর্যন্ত রূপমতীকে ফিরে আসার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে চিরতরে ত্যাগ করে চলে যায়। এ গল্পের অন্যতম একটি চরিত্র হচ্ছে লালুয়া কুড়ুখ। সে একদিকে প্রেমিকা রূপমতীর নামে কুৎসা রটনা নিয়ে ভিখারিয়া নাটুয়ারা রামলীলার মাঠে গান বাঁধলে ক্রোধে অপমানে দিশাহারা হয়ে প্রতিবাদ করতে দ্বিধাবোধ করেনি, সে-ই আবার পঞ্চায়েতের জঘন্যতম শাস্তির শিকার রূপমতীকে আশ্রয় দিতে সাহস পায় না। আসলে লেখক রমাপদ চৌধুরী ভয়হীনতা ও ভীরুতার আশ্চর্য মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন লালুয়া কুড়ুখ চরিত্রে। গল্পের পরিণতিতে দেখা যায় রূপমতীর কবর পরিণত হয় গ্রাম্য থানে। সান্তালপল্লীর সবাই এসে বসতে শুরু করল রূপমতীর কবরের পাশে। শুরু হয় মুরগি বলি, পৌষ পরবের নাচ। ওঁরাও, মুণ্ডা, সান্তাল, হো সবাই মিলে বাঁধিয়ে দেয় সেই কবর, আর তার ওপর নাম লেখা হয় রূপমতী নয়, রেবেকা ফার্নহোয়াইট নয়, মাধো সোরেনের মেয়ে রেবেকা সোরেন। আর এখানেই গল্পটির চূড়ান্ত ট্র্যাজিক পরিণতি ঘটে যা লেখক নিপুণ দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

'ঝুমরা বিবির মেলা' গল্পটি গ্রন্থাকারে 'আপনপ্রিয়' গ্রন্থে প্রকাশিত হয় ১৩৬৪ সালে। 'ঝুমরাবিবির মেলা' গল্পটিও মিঞা মাঝির সন্তান স্নেহ এবং সেই সন্তানকে ডাইনির হাত থেকে বাঁচানো— এসমস্ত কিছু মিলিয়ে যেন কিংবদন্তী হয়ে ওঠে। গল্পটির কেন্দ্রবিন্দুতে আছে বৃদ্ধ মিঞা এবং ঝুমরা বিবি। মিঞা মাঝি কুখ্যাত ডাকাত বুধন কিস্কুর বাবা। যে ডাকাত বুধন প্রতিনিয়ত চুরি, ডাকাতি, খুনোখুনি, রাহাজানি করে বেড়ায়, যার ভয়ে সোনাডির তুড়ুক চাষীরা তটস্থ। ছেলে সৎপথে ফিরে আসবে, ছেলে ভাল হয়ে যাবে এই বিশ্বাসে বৃদ্ধ মিঞা মাঝি ছেলের কৃত খুনকে নিজের ঘাড়ে নিয়ে নেয় এবং মৃতব্যক্তিটি নিজের ছেলে বলে চালিয়ে নেয়। তাই মৃত ব্যক্তির মাথাটি হাতে করে থানায় নিয়ে এসে বলে—

> ''হোঁ থানা-হাকিম। আপনারাই তো লঁটকে দিতিস হুজুর, তা বেঁটারে আমি কোঁপাই দিছি ? ... বোঙারা স্বপ্ন দিলেন, বেঁটারে কুঁরবান দে; তো কুঁরবান দিছি, এখুন লঁটকে দে।''[২১]

যে মিঞা মাঝি ছেলে ভাল হয়ে যাওয়ার প্রত্যাশায় ছেলের হয়ে মিথ্যে সাক্ষী দেয়, সে-ই আবার বিশ্বাসভঙ্গের যন্ত্রণায় আত্মহত্যা করে। এ গল্পে আরেকটি দিক লক্ষ করার মত, ঝুমরা বিবির প্রসঙ্গ, যা কে গ্রামের লোকরা ডাইনি বলে ভাবত। যে ঝুমরা বিবি আর দশটা মানুষের মতো বাঁচতে চেয়েছিল, কিন্তু ডাইনি অপবাদ দিয়ে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেয়। ভাবতেও অবাক লাগে ষাটের দশকে লেখা রমাপদ-র গল্প 'ঝুমরা বিবির মেলা' আজকের একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বায়নের যুগেও ডাইনি অপবাদে লোককে হত্যা করা তো বর্বরতারই নামান্তর। গল্পটির আগাগোড়া তুড়ুক চাষীদের অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, অলৌকিকতা ঘিরে থাকলেও, সোনাডির তুড়ুক চাষীরা মিঞা মাঝি এবং ঝুমরা বিবিকে ভুলে থাকতে পারে না। তাই প্রতি বছর শীতের দিনে মেলা বসে—'ঝুমরা বিবির মেলা'। সাতদিন ধরে চলে এই মেলা। মেলায় স্থানীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নৃত্য, মিঠাই, রঙিন জলচুড়ি এবং প্রধান আকর্ষণ হিসেবে থাকে মোরগ লড়াই। আমাদের কাছে ঘটনার সত্যতার চেয়েও বড়ো হয়ে ওঠে স্থানীয় সংস্কার ও সংস্কৃতির উপস্থাপনা। ফলে লেখকের নিপুণ হাতের স্পর্শে এই আখ্যান বর্তমান সময়েও বাস্তবের সামাজিক দলিল হয়ে উঠেছে। এভাবে আমরা দেখতে পাই কথাকার রমাপদ চৌধুরীর গল্পবিশ্বের বহু বিচিত্র বিষয় ও অভিনব জীবন্ত চরিত্র। বিচিত্র সমাজ ব্যবস্থার আনাচে কানাচে লুকিয়ে থাকা বিষয়কে লেখক আশ্চর্য দক্ষতায় তুলে এনেছেন তাঁর ডালিতে।

।।দুই।।

স্থানীয় ঘটনার ইতিবৃত্ত নিয়ে লেখা রমাপদ চৌধুরীর আরেকটি উল্লেখযোগ্য গল্প 'সতী ঠাকুরুণের চিতা'। গ্রন্থাকারে ১৩৬৪ সালে 'আপন প্রিয়' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। বাঁকুড়া রায়ের থানে যাত্রাসিদ্ধিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এবং এর অন্তরালে সতীদাহের কলঙ্ক মুছে ফেলার জন্য অশিক্ষিত ডোমপল্লীর পূজারীর প্রথম বিদ্রোহের প্রয়াসের দলিল হয়ে ওঠে 'সতী ঠাকুরুণের চিতা' গল্পটি। গল্পটিতে অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যের কন্যা কল্যাণী ধর্মঠাকুর বাঁকুড়া রায়ের পুজো দিতে মন্দিরে যেত, যেখানকার সেবাইত ঠাকুর ডোম যশাই পণ্ডিত। যশাই পণ্ডিতের মতে যেদিন কল্যাণী মন্দিরে

পুজো দিতে আসে না, সেদিন বাঁকুড়া রায়ের পূজা অসম্পূর্ণ থাকে। যশাই ডোম হয়েও পণ্ডিত। একথা অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যের কানে এসে পৌঁছায় এবং ধর্মরক্ষা ও যশাই পণ্ডিতকে গ্রাম থেকে তাড়ানোর উপায় বের করলেন—

> ''ধর্মরক্ষার কোনও পথ খুঁজে না পেয়ে গ্রামেরই এক আশি বছরের কুলীন বৃদ্ধের সঙ্গে কল্যাণীর বিয়ে দিয়ে দিলেন তিনি। আর নিজের বৈঠকখানায় বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। বললেন, স্বপ্নাদেশ পেয়েছি ওই ডোম কলঙ্ককে গ্রাম থেকে তাড়াতে হবে।''[২২]

স্বভাবতই আশি বছরের বৃদ্ধ কল্যাণীর জীবনে দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হয় না। অকলঙ্ক বাড়ুজ্যের একদিকে সন্তান স্নেহ অন্যদিকে ভয় তার আরও দুটি অবিবাহিতা মেয়ে আছে, যার জন্য সতীত্ব প্রমাণ করতে কল্যাণীকে আত্মাহুতি দিতে হবে, তথাকথিত স্নেহশীল পিতা কন্যার আত্মাহুতিকেই বরণ করে নেন। আসলে 'সমাজ' নামক জীবটা চিরকাল মেয়েদেরই সতীত্বের পরীক্ষা নিয়েছে, তার মনের পরিত্রতাকে কখনো ঠুঁলি আঁটা চোখে দেখতে পারেনি। আর তারই স্বরূপ লেখকের লেখনীতে চমৎকারভাবে ধরা দিয়েছে—

> ''—সতীই ছিল কল্যাণী মা! বললেন অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে, তারপর নিজে পরীক্ষা করে দেখলেন কল্যাণীর বাঁধনগুলো। স্বামী মরলে সতী হতেই হবে এমন কোনও কথা নেই। কিন্তু কল্যাণীর নামে অপবাদ যখন আছে আর অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যের আছে আরও দুটি অনূঢ়া মেয়ে, তখন সতী হতেই হবে কল্যাণীকে।''[২৩]

তাই একমাত্র যশাই পণ্ডিতই রুখে দাঁড়ায় কল্যাণীর সতী হওয়ার বিরুদ্ধে। যদিও সতী হওয়ার বিরুদ্ধে অন্য কোন যুক্তি খাঁড়া করে না, শুধুমাত্র কল্যাণীর মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে, কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না। যশাই তার এতদিনকার বিশ্বাসের জায়গা ধর্মঠাকুর বাঁকুড়া রায়ের থানে যাত্রাসিদ্ধির প্রতিষ্ঠা করে। আর এখানেই তথাকথিত উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ্য সমাজের

প্রতি যশাই পণ্ডিতের তীব্র ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার মধ্য দিয়ে সংস্কারের নামে সতীদাহের হিংস্রতাকেই আঘাত করে। সে বলে ওঠে—

> ''... যে বামুন নিজের মেয়েকে জীবন্ত পোড়াতে পারে, সে জাত যেন এ মণ্ডপে না ঢোকে। বামুন ছাড়া সবজাতের পুজো নেবেন যাত্রাসিদ্ধি।''[২৪]

তাই প্রতিবাদী যশাই কল্যাণীর ফিরে আসার আশায় বুক বাঁধে। সে জন্য মৃত্যুর সময় যাত্রাসিদ্ধির মন্দিরে বামুনদেরও প্রবেশের অনুমতি দেয়, কারণ ''... কল্যাণী হয়তো পরজন্মে আবার আসবে। হয়তো বামুনদের ঘরেই জন্ম নেবে আবার। আমাকে এমন জায়গায় পুঁতে রাখবি রামাই, কল্যাণী এলে যেন তার পায়ের শব্দ শুনতে পাই।''[২৫] আর সেজন্যেই যশাই পণ্ডিতের নির্দেশমতো যাত্রাদিদ্ধির মন্দিরের সামনে তার শবদেহ সমাধিস্থ করা হয়।

স্থানীয় লোক পরম্পরা, কিংবদন্তী নিয়ে লেখা 'দরবারী', 'রেবেকা সোরেনের কবর', 'ঝুমরা বিবির মেলা', 'সতী ঠাকুরুণের চিতা' এই গল্পগুলির পাশাপাশি সরাসরি ইতিহাস নিয়েও রমাপদ চৌধুরী গল্প লিখেছেন 'একটি কিংবদন্তী' এমনই একটি ইতিহাসাশ্রয়ী গল্প। 'একটি কিংবদন্তী' ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'কখনো আসেনি' গল্পগ্রন্থে। এই গল্পের সূচনায় রমাপদ ইতিহাস ও সাহিত্যের যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে বলেছেন—

> ''ইতিহাসের পাতা থেকে যা তুলে আনা যায় তা নিটোল কোনও গল্প হতে পারে না। যা গল্প তা ষোলো আনা ইতিহাস নয়। ... কল্পনার উত্তাপ লেগে অতীতের কঙ্কাল যেন রক্তমাংসের স্পর্শ নিয়ে আসে, নতুন করে।''[২৬]

এরই যথাযথ প্রয়োগ ঘটে 'একটি কিংবদন্তী' গল্পে। ইতিহাসের বিষয়বস্তু নিয়ে গল্প রচিত হলেও লেখকের শিল্পী সত্তার নৈপুণ্যে একটি মেয়ের প্রতিশোধের কাহিনিই এখানে বড়ো হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গক্রমেই মনে পড়ে রমাপদ চৌধুরীর ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস 'লালবাঈ'। 'লালবাঈ' উপন্যাসে ইতিহাসেরপরিবর্তে প্রাধান্য পেয়েছে একটি নারীর প্রতিশোধের ইতিবৃত্ত। নিবিড় পাঠে এরই যেন

স্বতন্ত্র রূপ ধরা পড়ে 'একটি কিংবদন্তী' গল্পে। গল্পে রাজা বল্লাল সেন চরিত্রে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন ধর্মপ্রাণা প্রজা অন্তঃপ্রাণ রাজা যার প্রজারা বিশ্বাস করে সনাতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা চান বল্লাল। সেই রাজা বল্লাল সেন সামাজিক বিধানের নামে প্রজাদের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর তুলে দিয়ে নিজের সিংহাসনকে অটুট রাখতে চান। কারণ—

> "ব্রাহ্মণের একতাকে ভয় পেতেন তিনি, তাই কৌলীন্যের প্রাচীর গেঁথে বিভেদ সৃষ্টি করেছেন তাদের মাঝে। বৈশ্যকেও ভয় পেতেন বল্লাল। ভয় পেতেন বৈশ্যকুলপতি শ্রেষ্ঠী বল্লভানন্দের ধনশক্তিকে। জানতেন, বল্লভানন্দের ইঙ্গিতে সমগ্র বৈশ্য প্রজারা এসে দাঁড়াতে পারে শ্রেষ্ঠীর পেছনে। জানতেন, ধনী বল্লভানন্দের অর্থলোভে তাঁর প্রতিটি সৈনিকের হাতের অস্ত্র খসে পড়তে পারে যে কোনও মুহূর্তে।"[২৭]

তিনি জানতেন প্রজাকে বিদ্রোহী করে তুলতে পারে একমাত্র ব্রাহ্মণ আর বৈশ্য। তাই ব্রাহ্মণকে দুর্বল করেছেন রাজা বল্লাল, শ্রেষ্ঠী সমাজ থেকে বল্লভানন্দকে পতিত করে দুর্বল করে দিয়েছেন। আর তাই পিতার চরমতম অপমানের প্রতিশোধ নিতে শ্রেষ্ঠী কন্যা পদ্মিনী রাজাকেও পতিত করে। রাজা বল্লাল সেনের সামাজিক বিধান অনুযায়ী— "... নীচজাতীয়, নীচ কুলোদ্ভবের সংস্পর্শদোষ ঘটলে পতিত হতে হবে তাকে। সমাজের মর্যাদা হারাতে হবে।"[২৮] রাজা বল্লাল সেনের প্রমোদ কাননের পরমাসুন্দরী পদ্মিনীর পুত্রেষ্টি যজ্ঞের প্রাক্কালে রাজপুরোহিতকে তার পিতৃপরিচয় গোপন করে বলে ওঠে— "...আমি হড্ডিকা, নীচতম কুলের কন্যা। কিন্তু আমি রাজার উদ্যান কুসুম।"[২৯] তাই অস্পৃশ্যা রমণীকে অঙ্কশায়িনী করায় ব্রাহ্মণকুল, পত্নী একমাত্র পুত্র সবাই রাজাকে ত্যাগ করে চলে যায়। এখানেই ইতিহাসের নিরিখে বা ঐতিহাসিক উপাদানে একটি মেয়ের পিতৃ অপমানের প্রতিশোধের কাহিনি প্রাধান্য লাভ করার মধ্যে গল্পটিতে একটি অনন্য মাত্রা সংযোজিত হয়ে যায়।

ইতিহাস বা ইতিহাস চেতনা রমাপদ-কে শুধুমাত্র সময় সচেতন করে তোলেনি, পাশাপাশি তাঁর পারিপার্শ্বিক অবস্থানকেও নতুন করে দেখতে, ভাবতে শিখিয়েছে। রমাপদ যখন কলকাতা

আসেন পড়াশোনা করার জন্য তখন দেশ জুড়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মন্বন্তর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা সবমিলিয়ে এক উত্তাল পরিবেশ। খুব স্বাভাবিকভাবেই এইসমস্ত বিষয় তাঁর রচনার উপাদান হয়ে উঠে এসেছে।

'এক খিলি মিঠে পান' গল্পে সেই সময়ের যথার্থ রূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে পনেরো বছর ব্যবধানে ঘটিত দুটি সাধারণ ঘটনার মধ্য দিয়ে। পনেরো বছর আগে চিলে ছোঁ মেরে সদেশের ঠোঙা কিশোর কথকের হাত থেকে মাটিতে ফেলে দিলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় কথকের চোখে জল এসে যায়, দোকানদার বিনা পয়সায় আবার সন্দেশ দেয়। কিন্তু পনেরো বছর পর সেই একই মানুষ একই দোকানদারের দোকান থেকে কেনা মিঠে পানের খিলিটি কথকের হাত থেকে পড়ে গেলে ও যেন খেয়াল করে না। কথক অনুভব করেন—

> ''না, মনে হল না, বাবুলাল মানুষ বদলে গেছে। শুধু বুঝতে পারলাম, একটি সত্যিকারের যুদ্ধ অতিক্রম করে এসেছি আমরা। টাকার মর্ম বুঝতে শিখেছি।''[৩০]

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বদলায়, বদলে যায় তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আর এটাই স্বাভাবিক। বরং পরিবর্তন না হওয়াটাই আমাদের কাছে অস্বাভাবিক এবং অকল্পনীয়। জীবনের এই পরিবর্তিত রূপকে নিয়ে গড়ে উঠেছে 'গত যুদ্ধের ইতিহাস' গল্প। গল্পের ব্যঞ্জনা ধরা পড়েছে পিতৃপরিচয়হীন দুই ভিখারি বালকের কথোপকথনে। গল্পটির ঘটনাক্রম বা কাল হল ১৯৪০, ১৯৪২, ১৯৪৩, ১৯৪৪ এবং ১৯৫০ সাল। গল্প কথকের দৃষ্টিতে পাঁচটি সংযোগমূলক দৃশ্যের কালানুক্রমিক বর্ণনা। ১৯৪০ সাল—কথক 'প্রেসিডেন্সি' কলেজের ছাত্র। দোকানে সিগারেট কিনতে যাওয়া কথককে হঠাৎ একটি মেয়েলি কণ্ঠ বলে—'দুটো পয়সা দেবেন?' মেয়েটির বর্ণনা দিতে গিয়ে কথক বলেন—

> ''বছর তেরো চৌদ্দ বয়সের একটি ফর্সা মুখ। কাঠির মতো রোগা শীর্ণ চেহারা, কিন্তু চোখ দুটো কেমন করুণ গভীর। কপালে একটা খয়েরের কিংবা বিন্দির টিপ। তার শরীরে জড়ানো ছাপা শাড়িটায়, চুলে আর মুখে, অল্প হলেও একটা সযত্ন প্রসাধন

ছিল। ... বলল, ব্যান্ডেলে ফিরে যাব, দুটো পয়সা কম পড়ছে, দিন না দুটো পয়সা।"[৩১]

১৯৪২ সাল সেই মেয়েটির বর্ণনা কথক দিচ্ছেন এভাবে—

"মেয়েটির পরনে লালপাড় সাদা শাড়ি, কপালে ডগডগে সিঁদুরের ফোঁটা, সিঁথিতে চওড়া করে টানা সিঁদুর, আর হাতে মাটির সরায় বেলপাতায় লেপা সিঁদুর... সঙ্গের ছেলেটি যে ওর স্বামী তা বুঝতে অসুবিধা হল না। ... মেয়েটির শরীরে অদ্ভুত পরিবর্তন এসেছে। সেই শীর্ণ কিশোরী মেয়েটি যেন যৌবনের পরিপূর্ণতার ঘাটে এসে পৌঁছেছে। সেই বিষন্ন মুখে কি এক বিচিত্র উদ্মাদনা।"[৩২]

১৯৪৩ সাল—সেই মেয়েটির বর্ণনা—

"সাদা চাদরের মতো মুখ। বিষণ্ণ, ক্লান্ত, পরাজিত। একটা সরু কালোপাড় ধুতি পরনে, মাথায় ঘোমটা, কোলে একটি বাচ্চা শিশু—সিঁথির সিঁদুর মুছে গেছে।"[৩৩]

১৯৪৪ সাল, সেই মেয়েটির অবস্থান উঠে এসেছে এভাবে—

"দোলের দিন। ... বেয়াদপির রঙে রাঙা জন পাঁচেক নেকড়ে মানুষ। মাঝখানে একটি মেয়ে। সারা শরীর তার রঙে আর আবীরে মাখা। তার একরাশ ফাঁপানো চুলে যৌবনের আগুন। প্রথমটা চিনতে পারিনি। গাড়ি থেকে নেমে মেয়েটি দু হাতে ওর এলো চুলের রাশিকে খোঁপায় জড়ালে, শাড়ির প্রান্তে মুখের রঙ মুছলে। আর তখনই চিনতে পারলাম।"[৩৪]

কথক সেদিন মনে মনে প্রার্থনা করেছিলেন যেন এই মেয়েটিকে আর দেখতে না হয়। কিন্তু আবার

দেখা হয়—

> ‘‘রাত ন’টা হবে হয়তো। ... হঠাৎ এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালাম। রাস্তার ধারে গাছের নির্জন ছায়া-ছায়া অন্ধকারে একা একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে তার মুখ দেখা গেল না। কিন্তু সে যে বাঙালি, শাড়ির বদলে কোমরে বেল্ট বাঁধা লম্বা কেমিজটাকে প্রায় গাউনের ভাব দিলেও বুঝতে ভুল হয় না। ... সামনের ব্যারাক থেকে একটি টমি বেরিয়ে এল, এসে দাঁড়াল মেয়েটির সামনে। সিগারেট বের করে দিল মেয়েটিকে। তারপর দুজনেই সিগারেট ধরিয়ে এগিয়ে গেল লেকের ঘাস গাছ জলের অন্ধকারে। ... ঠুলি পরা ল্যাম্প পোস্টের কাছে গিয়ে ওরা পৌঁছতেই আমি শিউরে উঠলাম। ... সেই বিস্মৃত মুহূর্তের ছবিটা নতুন করে চোখের সামনে ভেসে উঠল। সেই ক্লান্ত বৈধব্যের কোলে একটি ছোট্ট শিশু। একটি পরাজিত মুখে মাতৃত্বের গৌরব।’’[৩৪]

আসলে যে সময় ও সামাজিক পরিকাঠামোয় ঘটনার বিবরণ ওঠে এসেছে, সেখানে একটি মেয়ের ভিখারি থেকে বারাঙ্গনায় উত্তরণ তা যেন সেই কুচক্রী সমাজব্যবস্থার নগ্নরূপটি গল্প কথকের বয়ানে ফুটে উঠেছে। এই পর পর ঘটনাগুলিই মূলত ১৯৫০ সালের ঘটনার প্রেক্ষিত তৈরি করে দিয়েছে। রাস্তা মেরামত করার জন্য রাখা বালির উপর দুটো ছ’সাত বছরের কালো কুলো ছেলে মারামারি করার সময় কথক ও কথক বন্ধুর সেখানে উপস্থিতি এবং মারামারির কারণ জানতে চাইলে তাদের নিজস্ব বয়ান উঠে এসেছে এভাবে—

> ‘‘একজন দাঁত বের করে বললে, ও শালা বলছে ওর বাবা সাহেব। আরেকজন বললে, ও শালার বাবা নেই বাবু। বলেই খিলখিল করে হাসল। সঙ্গের বন্ধু জিজ্ঞেস করলে, কে আছে তোদের?

বাবা-মা আছে? দুজনে একই সঙ্গে বলল, কেউ নেই বাবু। ...সহানুভূতির স্বরেই বন্ধুটি প্রশ্ন করলে, মা? ছোট ছেলেটা হেসে উঠল, বললে, কি জানি বাবু, সে মা বেটীই জানে, বেঁচে আছে না মরে গেছে।"[৩৬]

আসলে গল্পের শেষে পিতৃপরিচয়হীন ভিখারি বালকের মধ্যে রমাপদ আবিষ্কার করেছিলেন সেই ভারতবর্ষকে যার জন্ম যুদ্ধ, দাঙ্গা ও মন্বন্তরে। আর এসবের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে যেন একটি নারী, সমাজের নানাবিধ পরিস্থিতির মধ্যে তার বিনির্মিত হওয়ার চিত্র।

'ভারতবর্ষ' গল্পটি ১৬ নভেম্বর ১৯৬৮ (১৩৭৫ বঙ্গাব্দে) খ্রিস্টাব্দে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক ক্লিন্টন বি সিলি গল্পটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। আমেরিকা থেকে প্রকাশিত 'লিটারারি অলিম্পিয়ান' সংকলনে গল্পটি ছাপা হয়। ছেষট্টির খাদ্য আন্দোলন-হরতাল, সাতষট্টির যুক্তফ্রন্ট সরকার, নকশালবাড়ি আন্দোলন, যুক্তফ্রন্টের ভাঙন, আটষট্টির জরুরীকালীন অবস্থা—এই রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে দাঁড়িয়ে রমাপদ চৌধুরী প্রায় তিন দশক আগের যুদ্ধের উন্মত্ত ও উত্তাল রাজনৈতিক সময়ের অবস্থানকে তুলে ধরেছেন 'ভারতবর্ষ' গল্পে। আখ্যানের স্থান বিহার-পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী অচেনা অস্থায়ী 'আন্ডা হল্ট' বা 'ভুরকুন্ডা'। প্রসঙ্গকথায় গল্পটি সম্পর্কে লেখকের অভিমত হলো—

"দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বারবার গিয়েছি, থেকেছি রাঁচি হাজারিবাগ পালামৌ অঞ্চলে। ঐসব অঞ্চলের কয়লাখনি নিয়ে গল্পও লিখেছি। কিন্তু যুদ্ধের যে প্রভাব পড়েছিল ঐ-সব এলাকায় তা নিয়ে গল্প ভারতবর্ষ।"[৩৭]

আখ্যানের কথক উত্তম পুরুষের বয়ানে তুলেছেন এর প্রেক্ষিত—

"ফৌজী সংকেতে নাম ছিল বি এফ থ্রি থার্টি টু। BF332 সেই আদপে কোনও স্টেশনই ছিল না, না প্ল্যাটফর্ম, না টিকিটঘর। শুধু একদিন দেখা গেল ঝকঝকে নতুন কাঁটা তার দিয়ে রেল

> লাইনের ধারটুকু ঘিরে দেওয়া হয়েছে। ব্যস, ওইটুকুই। সারাদিনে আপ-ডাউনের একটা ট্রেনও থামত না। থামত শুধু একটি বিশেষ ট্রেন। হঠাৎ এক একদিন সকালবেলায় এসে থামত। কবে কখন সেটা থামবে, তা শুধু আমরাই আগে থেকে জানতে পেতাম, বেহারী কুক ভগোতীলালকে নিয়ে আমরা পাঁচজন। স্টেশন ছিল না, ট্রেন থামত না, তবু রেলের লোকদের মুখে মুখে একটা নতুন নাম চালু হয়ে গিয়েছিল। তা থেকে আমরাও বলতাম 'আন্ডা হল্ট'।"[৩৮]

পাশেই বেঁটেখাটো পাহাড়ী টিলার নীচে মাহাতোদের গ্রাম। পাহাড়ের ঢালুতে পাথুরে জমিতে তারা ক্ষেতি করে সর্ষে, বেগুন, ঝিঙে ইত্যাদি ফসল ফলাত। মুরগী পালন করত। দূরে ভুরকুন্ডার শনিচারী হাটে সেই মুরগী কিংবা মুরগীর ডিম, ক্ষেতের ফসল বিক্রি করতে যেত। কখনও সাধের মোরগ বগলে চেপে মোরগ লড়াই খেলতে যেত। মাহাতোরা দিব্যি ক্ষেতে-খামারে কাজ করে, গুলতি নয়তো তীরধনুক নিয়ে খাটাশ মারে। লাটুয়া গান শোনে। হাঁড়িয়া খায়। মাহাতোদের সাবেকি এই জীবন দেখে কথকের চোখ জুড়িয়ে যায়। গল্পে আছে—

> "দূরে দূরে পাহাড়, মহুয়ার বন, খয়েরের ঝোপ পার হয়ে একটা ছোট্ট জল-চোঁয়ানো ঝরনা, মাহাতো গাঁয়ের সবুজ ক্ষেত। চোখ জুড়িয়ে যায়, চোখ জুড়িয়ে যায়। তার মধ্যে কালো কালো নেংটি-পরা মানুষ।"[৩৯]

আন্ডা হল্টের নির্জন স্টেশনে তারা আসত না। রাতারাতি একসময় আন্ডা হল্ট হল্ট-স্টেশন হয়ে গেল। মোরম ফেলে লাইনের ধারে কাঁটাতারে ঘেরা জায়গাটুকু উঁচু করা হল প্ল্যাটফর্মের মতো। এরপর শুধু পি এ ডবলু নয়, মাঝে মাঝে মিলিটারি স্পেশাল এসে দাঁড়াত। গ্যাবার্ডিনের প্যান্ট পরা হিপ পকেটে টাকার ব্যাগ গোঁজা আমেরিকান সৈনিকদের স্পেশাল। মাহাতোরা কেউ স্টেশনের কাছে আসত না। ট্রেনের শব্দ পেলে কেবল দূরে ক্ষেতিতে কাজ করতে করতে সোজা

হয়ে দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকত। কিন্তু হঠাৎ একদিন কাঁটাতারের বেড়ার ওপাশে মাহাতোদের একটি নেংটি পরা ছেলেকে দেখা গেল। সে অবাক চোখে ট্রেন আর লালমুখো আমেরিকান সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে আছে। একজন সৈনিক 'হে-ই' বলে চিৎকার করতেই সে ভয়ে দৌঁড় দিয়েছে গাঁয়ের দিকে। মাহাতো গ্রাম থেকে এরপর একজন, দুজন করে ভিড় জমিয়ে ট্রেন দেখতে আসে। আমেরিকান একজন সৈনিক পকেট থেকে চকচকে আধুলি বের করে তাদের দিকে ছুঁড়ে দেয়। তারা একে অপরের দিকে চাওয়া চাওয়ি করে। সবাই নিঃশব্দে চলে যায়। ট্রেন চলে যাবার পর ওদের নিঃশব্দে চলে যেতে দেখে গল্প কথক বলেছিলেন—''সাহেব বখশিস দিয়েছে, বখশিস, তুলে নে।''[৪০] এমনকি আধুলিটা মাহাতোদের অধিপতি বুড়োর হাতে তুলে দিলেও তিনি সেটা গ্রহণ না করে নীরবে চলে যান। কারণ ওরা তো ভিখিরি নয়, ক্ষেতিতে কাজ করা মানুষ। করুণা আর অবজ্ঞা মিশিয়ে খুচরো পয়সা ছুঁড়ে দিলে তারা গ্রহণ করে না। এই প্রত্যাখানের মধ্য দিয়ে মাহাতোদের অহমিকা প্রকাশ পেয়েছে গল্পে। নিজের জমিতে ক্ষেতি করে জীবন-যাপন করা এদের কাজ। যে হাত দিয়ে তারা মাটি কোপায় ক্ষেতি করে, ধনুক ধরে সেই হাত দিয়ে তারা ভিক্ষে নেয় না। শুধু তাই নয়, বুড়ো মাহাতোকে আন্ডাহল্টের তাবুতে গিয়ে সবজি, চিংড়ি, সরপুঁটি, মৌরলা বেঁচে আসার প্রস্তাব দিলে তিনি হেসে বলেছিলেন— ''ক্ষেতির কাজ ছেড়ে যাব নাহ।''[৪১]

আসলে ঔপনিবেশিক আগ্রাসন তখনও তাদের গ্রাস করেনি। আর করেনি বলেও জমিকে আঁকড়ে ক্ষেতের কাজে আপন মনে নিজেদের মতো জীবন অতিবাহিত করেছে পাহাড়ের নীচে সবুজ প্রান্তরে। কিন্তু ঔপনিবেশিকতার কালো হাতের স্পর্শ থেকে দূরে থাকা কি আদৌ সম্ভব হল মাহাতোদের? হল না। একদিন কলোনির রক্ষাকারীরাই 'নে বখশিস' বলে তাদের টেনে আনলেন বশ্যতার সংস্কৃতির বলয়ে। ফলে কোমরের ঘুনসিতে লোহাবাঁধা সেই ছেলেটি বাবুকে হাটের রাস্তায় পেয়ে বলে ''টিরেন আসবে না বাবু?''[৪২] খাটো শাড়ির মাহাতো যুবতী হাসতে হাসতে জানতে চায় ''টিরেন কবে আসবে?''[৪৩] এখন ট্রেন এলেই মাহাতো গ্রামের লোকেরা প্রায় সকলেই চলে আসে। আর আমেরিকান সৈন্যরা সিকি, আধুলি, কয়েন পকেট থেকে মুঠো মুঠো বের করে

ছুঁড়ে দেয় তাদের দিকে। ট্রেন চলে যাওয়ার অপেক্ষা না করেই তারা হুড়োহুড়ি করে পয়সা কুড়ায়—আমেরিকান সৈন্যরা তা দেখে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। গল্পকথক ও ভগোতীলাল ভেতরে ভেতরে লজ্জা পেতে থাকেন। এরমধ্যে —

> ''হঠাৎ এক একদিন মাহাতো বুড়োকে দেখতে পেতাম। কোনওদিন ক্ষেতের কাজ ফেলে দু হাতের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে হনহন করে এগিয়ে আসত, রেগে গিয়ে ধমক দিত সকলকে। ওর কথা শুনছে না বলে কখনো বা অসহায় প্রতিবাদের চোখে গাঁয়ের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকত। কিন্তু ওর দিকে কেউ ফিরেও তাকাত না। সৈনিকরা হিপ পকেটে হাত দিয়ে হা-হা করে হাসতে হাসতে মুঠো ভরতি পয়সা ছুঁড়ে দিত। মাহাতো-গাঁয়ের লোক হুমড়ি খেয়ে পড়ত সেই পয়সাগুলোর ওপর, নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে ঝগড়া বাধাত। তা দেখে সৈনিকরা হা-হা করে হাসত।''[৪৪]

কিছুদিন এভাবে যাওয়ার পর কাঁটাতারের বেড়ার ওপার থেকে ওরা 'বখশিস বখশিস' বলে চিৎকার করছে, আর একজন ইংরেজ অফিসার সেই চিৎকার শুনে থুথু ফেলার মতো করে বলে উঠল—'ব্ল্যাডি বেগার্স'। অপমানে, অক্ষম রাগে গল্প কথকের সমস্ত ক্ষোভ মাহাতোদের ওপর পড়ল। এতোকিছুর মধ্যেও সমস্ত লজ্জা যেন একটা অহঙ্কারের মধ্যে জমিয়ে রেখেছিলেন কথক। তিনি মাহাতোদের অধিপতি। পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে সমস্ত অহঙ্কার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত কথকের চোখের সামনে। কিন্তু এই লজ্জাও মাটিতে মিলিয়ে গেল, যেদিন সমস্ত ভিড়ের সঙ্গে মিশে গিয়ে উন্মাদের মতো, ভিক্ষুকের মতো মাহাতো বুড়োও হাত বাড়িয়ে চিৎকার করছে, সাব বখশিস, সাব বখশিস।

> ''আমরা জানতাম ট্রেন আর থামবে না। ট্রেনটা চলে গেল। কিন্তু মাহাতো গাঁয়ের সবাই ভিখিরী হয়ে গেল। ক্ষেতিতে চাষ করা মানুষগুলো সব—সব ভিখিরী হয়ে গেল।''[৪৫]

প্রায় তিন দশক আগের একটি সময়কে গল্পে তুলে এনে রমাপদ চৌধুরী জীবনের কোন বাস্তব সত্যকে নির্মাণ করতে চাইছেন তা এবার বোঝা দরকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে রেল। ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের স্বার্থ অনুযায়ী এইসময়ে উপনিবেশিকগুলিকে নানাভাবে ব্যবহার করেছে। যুদ্ধের বিপুল পরিমাণ খরচ তোলার জন্য তারা নতুন কৌশল প্রয়োগ করে উপনিবেশগুলির উপর। সৈনিকদের খাদ্য সরবরাহ করা হয় বিভিন্ন স্থান থেকে। ফলে স্থানিক খাদ্যসংকট দেখা দেয়। যদিও আন্ডাহল্ট বা ভুরকুন্ডার মাহাতোরা সেদিনের আর্থিক শোষণের কোনো লক্ষ্যমাত্রায় ছিল না। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের বীভৎস চেহারা আর ঔপনিবেশিক শক্তির আগ্রাসন এতোটাই ভয়ংকর যে পাহাড়ী টিলার মাহাতোদের জীবনকে পাল্টে দিয়েছে। এই শক্তির কাছে দাসত্বে পরিণত হয়েছে দেহাতি মানুষগুলো। কৃষি ভারতের ঐতিহ্য। গ্রামীণ সজীবতা ভারতবাসীর অহংকার কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ভারতবাসীর ঐতিহ্য ও অহমিকাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিল। যন্ত্রসভ্যতার হাতছানি, পুঁজি তাকে নিজের অজান্তেই ভিখিরি করে বানিয়ে তুলল কেবল শ্রমিক। ফলে মাটির সঙ্গে মানুষের টানের সুর লঙ্ঘিত হয়েছে সেদিনই। ১৯৬৭ সালের নকশাল আন্দোলনের মুহূর্তে রমাপদ চৌধুরীর ভাবনা যে কারণে নতুনভাবে আমাদের ভাবতে বাধ্য করে পুনরায় অতীতের দিকে চোখ ফেরানোর ইঙ্গিত দেয়। আদিবাসী মাহাতোদের জীবন ও জগৎ গোটা ভারতবর্ষের প্রতীকে উঠে এসেছে। ''ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের আত্মমর্যাদা হারানোর, ভিক্ষুকের মতো পশ্চিম পৃথিবীর দিকে হাত পেতে কৃপাকণা চাইবার দিন, গ্লানিময় ইতিহাস, মেরুদণ্ড ভেঙে কোলকুঁজো দাসানুদাস হবার বেদনা এই গল্পের বিন্দুতে অশ্রুজল, ধিক্কার, লজ্জার সিন্ধু হয়ে গেছে। 'প্রকৃত সম্পদ' হারিয়ে দেউল হয়ে গেছে যেন গোটা দেশ।''[৪৬] কেবল ভিখিরির হাতে ভিখিরির মুখ। সে মুখে অহংকার নেই। আছে শুধু মুখোশ পড়া ফূর্তির হাসি।

।। তিন ।।

সময় সচেতন রমাপদ-র 'হিসেবী' গল্প যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ আর মূল্যবৃদ্ধি —এই তিনের সংযোগে জীবনের শেষ সম্বলটুকু নিঃশেষ হয়ে গেলে মহীতোষ মান্যালকে গণ্যকার সেজে ফুটপাতে বসতে

হয়। যে মহীতোষবাবু সারাজীবন ধরে ভবিষ্যৎ ভাবনা নিয়ে শুধু হিসেব করেই গেলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হিসেব মেলেনি। যুদ্ধ, দাঙ্গা, মন্বন্তরে জিনিসের মূল্যবৃদ্ধির বাজার অর্থনীতিতে তিরিশ টাকা মাইনের কেরানী মহিতোষবাবুর চারশ টাকা মাইনের 'বড়বাবু'তে উত্তরণ ঘটে ঠিকই কিন্তু এই উত্তরণ ভবিষ্যৎ ভাবনা থেকে মহীতোষবাবুকে মুক্তি দিতে পারে না। আর সেজন্যই চাকরি ছাড়ার পর কখন বাইশ হাজার শূন্যতে পরিণত হয়ে যায়। দেখতে দেখতে—

> ''... বাইশ হাজারের অঙ্ক পনেরো হাজারে নেমে এল। ...
> পনেরো হাজারটা নেমে এসেছে দশ হাজারে। তারপর দশ হাজার
> থেকে পাঁচ হাজার, পাঁচ হাজার থেকে ফুড়ুৎ।''[৪৭]

আসলে মহীতোষবাবুদের হাতে থাকে হিসেবের খাতা, তারা শুধু হিসেব লেখার মালিক, হিসেব ঠিক করার নয়। সেই একই বিষয় পরিলক্ষিত হয় 'টাকার দাম' গল্পে। এই গল্পেও লক্ষ করা যায় যুদ্ধ, দাঙ্গা, মন্বন্তরের ফলে মূল্যবৃদ্ধির মাত্রাকে। 'হিসেবী গল্পে জীবনের শেষ সম্বলটুকু নিঃশেষ হয়ে গেলে মহীতোষবাবুকে গণ্যকার সেজে ফুটপাতে বসতে হয় আর 'টাকার দাম' গল্পে শিবতোষ বাবুর সারাজীবনের বাড়ি তৈরির স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। কারণ—

> ''বইয়ে-পড়া অর্থনীতির সঙ্গে জীবনের আর্থিক নীতির কোনও
> সম্পক নেই, কোনও মিল নেই। এ সমাজে নিজের চেষ্টাতেই
> নিজের জীবনকে সাজিয়ে নিতে হয়, নিজের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার
> ব্যবস্থাও নিজেকেই করতে হয়।''[৪৮]

শিবতোষবাবু একসময় ভেবেছিলেন, যুদ্ধ থেমেছে, জিনিসপত্রের দাম কমবে। চাল, চিনি, তেল, লোহা, সিমেন্ট কোনকিছুরই দাম কমে না। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই একসময় শিবতোষবাবু উপলব্ধি করতে পারেন, যে হারে সুদ জমে তারচেয়ে জিনিসের দাম অনেক বেশি বৃদ্ধি হয়। বিশেষত মধ্যবিত্ত জীবনকেন্দ্রিক রচনাশিল্পী রমাপদ বোঝাতে চেয়েছেন যে, আসলে মধ্যবিত্তের হাতে শুধু হিসেবের খাতাটাই থাকে, তাদের হাড়ভাঙা খাটুনির সারাজীবনের সঞ্চয় বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে বারবারই হেরে যায়। আর এভাবেই সুস্পষ্টভাবে সমকালের

ছবি তুলে ধরেছেন রমাপদ।

রমাপদ-র বেশকিছু গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে নারীচরিত্রের প্রাধান্য। এমনই একটি গল্প হচ্ছে 'রাঙা পিসিমা'। গল্পটি ১৩৬৪ সালে 'আপন প্রিয়' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। গল্পটিতে লক্ষ করা যায় পটের প্রতিমার মতো তার চেহারা, লম্বা দোহারা গড়ন, ফর্সা ধবধবে গায়ের রঙ। এমন রূপ ও ঐশ্বর্যের অধিকারিণী ছিলেন রাঙা পিসিমা। পনেরো বছর বয়সে তার বিয়ে হয়। কিন্তু এমন ঐশ্বর্যময়ী, অপরূপার প্রতি তার স্বামীর নাকি আকর্ষণ ছিল না।

> ''টান ছিল এক তান্ত্রিক গুরুর দিকে। পুজো আর্চা করতেন, তারপর হঠাৎ এক একদিন উধাও। আবার ফিরে আসতেন দু-দশ দিন পরে।... কেউ বলত, মাথায় ছিট আছে; কেউ বলত, ও জন্মবৈরাগী, গেরুয়া দেখলেই ওর মন ঘর ছেড়ে পালাতে চায়। ও ঠিক সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাবে একদিন।''[৪৯]

শেষপর্যন্ত বিয়ের তিনটি বছর কাটেনি, হঠাৎ একদিন উধাও হলেন তার স্বামী। স্বামীর খোঁজে তীর্থে তীর্থে বেরিয়েছেন কিন্তু কোথাও তার হদিশ পাননি। দীর্ঘ কয়েক বছর পর হঠাৎ একদিন তার স্বামী ফিরে এলে সরকার মশাই, মামাবাবু, মিনু সহ বাড়ির সকলে খুশিতে ভরে ওঠে। রাঙা পিসিমা ছিলেন ভাবগম্ভীর। নিরুদ্দেশ হওয়া স্বামীকে ফিরে পেয়েও তার মনে কোন আনন্দের প্রকাশ লক্ষ করা যায়নি। ফিরে আসা স্বামীকে তিনি যেন চিনতেই পারছেন না। আসলে যাকে স্বামী বলে জানতেন তিনি গেরুয়াধারী প্রায় বৃদ্ধ একজন মানুষ নন, সে একুশ বাইশ বছরের এক যুবক। আর তাই কথক 'আমি'-র কাছে নিভৃতে তার এই যন্ত্রণার লৌহ কপাট খুলে দেন—

> ''...যার কথা সারাজীবন ভেবেছি, যার খোঁজে সারা জীবন কেটে গেছে, সে যদি সত্যিই একদিন এসে হাজির হয় একেবারে অন্য চেহারা নিয়ে, সত্যিই যদি ফিরে আসে, সে যে কি অসহ্য ... আজ বুঝতে পেরেছি, তার কথা ভাবতে চাই, তাকে চাই না আর।''[৫০]

আর তাই স্বামী ফিরে আসার পরের দিন গঙ্গাস্নানে গিয়ে রাঙা পিসিমা নিরুদ্দেশ হয়ে যান। রাঙা পিসিমার এই নীরবতা একজন পুরুষের প্রতি নারীর প্রত্যাখ্যানের ভাবকেই প্রকাশিত করে। পুরুষের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার সাহস যে নারীর আছে তার পরিচয় পাই 'শুধু কেরানী' গল্পে। শারদীয়া 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৩৬৬ সালে। পরবর্তীতে একই সালে 'মুক্তবন্ধ' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। গল্পের পরিসর আবর্তিত হয়েছে একটি অফিসঘর এবং একটি চায়ের দোকানকে কেন্দ্র করে। যে অফিসঘরে কথক 'আমি' অর্থাৎ 'সন্ধ্যা' নামের মেয়েটি অ্যাপয়ন্টমেন্ট লেটার হাতে নিয়ে দুরুদুরু বুকে ভয় এবং জড়তা মিশ্রিত পদক্ষেপে রেকর্ড সেকশনের কাজে যোগ দেয়, সম্পূর্ণ অপরিচিত মহলে। ধীরে ধীরে পরিচয়ের পরিধি বিস্তৃতি লাভ করে। একসময় অফিসের সহকর্মী গৌরীর বিয়ের খবর শুনে তার মনটা খারাপ হয়ে যায়—''কবিতায় যাকে উদাস হওয়া বলে, ঠিক তেমনি। এতদিন পরে যেন আচমকা মনে হল আমি রেকর্ড সেকশনের একশো ছ'টাকা বেসিক স্যালারির একটি কেরানী মাত্র নই, আমি একটি মেয়ে।... ক'বছরে মাইনে বেড়ে একশো ছ'টাকা হয়েছিল, আর কানের পাশে দু-দশটি চুলও পেকেছিল। পাকা চুলগুলো রাখিনি, তুলে ফেলেছিলাম, কিন্তু মন থেকে তুলতে পারিনি।"[৫১] ফলে বহুদিনের সুপ্ত কামনা তার মধ্যে জেগে উঠে এবং সেই কামনা চরিতার্থতার পথ অভিলাষবাবু খুলে দিয়েছিল, কিন্তু সে বুঝে উঠতে পারে না—

> ''ঘর সংসারকে আমি ভয় পাই, না এই রেকর্ড সেকশনের
> ধুলোটে ফাইল আর ধোঁয়াটে মানুষগুলোকে ভালোবাসি?"[৫২]

প্রসঙ্গতই মনে আসে 'মনবন্দী' গল্পের নামহীন নারীচরিত্রটির কথা। যার পরিচয় হিসেবে লেখক জানিয়েছেন প্রথমে মিস মেন এবং পরবর্তীতে মিসেস ভট্টাচার্য। এই মেয়েটির চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য অপরকে হুকুম করা। ডাউন দিল্লী এক্সপ্রেসের থার্ড ক্লাসে প্রথম সাক্ষাতের মুহূর্তটি থেকে শুরু করে কয়েকবছর পর ভাইঝিকে স্কুলে ভর্তি করার সময় পুনরায় সাক্ষাৎ হলে এই নামহীন নারী কথককে নানাভাবে আদেশ দিয়ে থাকেন—কখনো ট্রেনে বসবার জায়গা করে দেওয়া তো কখনো নতুন ফ্ল্যাটের সন্ধান দেওয়া। এই মেয়েটির বাইরের রূপ ও ভেতরের রূপের মধ্যে যে বিরাট তফাৎ রয়েছে তা কথক আবিষ্কার করেন মেয়েটির অনুরোধে তার বাড়িতে এসে।

প্রতিনিয়ত অন্যকে আদেশ করে চলা এই মেয়েটি নিজের স্বামীর প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠ ও সেবাপরায়ণ। সেই সেবাপরায়ণা নারীকে তার শারীরিক কষ্টের প্রতি কথক ঈঙ্গিত করলে তিনি বলেন—

> ''কি যে বলেন, ওঁর জন্যই তো আজ ইস্কুলের টিচাররা আমাকে মান্য করে, ঈর্ষা করে, তা জানেন?''[৫৩]

যেন তা না জেনে কথক ভুল করেছেন। আসলে এরা স্বামীর পরিচয় পরিচত হওয়াকে গর্বের বিষয় বলে ভাবে। নিজের আইডেন্টিফিকেশন বলতে কিছু নেই। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় প্রথমে নারী নিজের পরিচিতি হিসেবে অবিবাহিত জীবনে পিতা ও বিবাহিত জীবনে স্বামীর পরিচয়কে নিজের আইডেন্টিফিকেশন বলে মনে করে এবং সেটাকেই পরম সুখ বলে মনে করে। কথক অবাক হয়ে ভাবেন— ''মানুষ সুখী হতে চায়? না সুখে আছি, এ কথা জানিয়ে সুখী হয়?''[৫৪] আসলে এ কোন একটি মেয়ের গল্প নয়, বিশ্বের হাজার হাজার নারীর ব্যক্তিত্বের অবমাননার গল্প হয়ে ওঠে। গল্পে চরিত্রটির কোন নাম না দেওয়া যেন লেখকের সচেতন মনস্কতারই পরিচায়ক। অন্যদিকে 'দুধের স্বাদ' গল্পের দরিদ্র গৃহিণী নিরুপমা বেঁচে থাকে সিনেমা নিয়ে।প্রতিদিনই সিনেমা দেখতে যায়। তার এই সিনেমা দেখতে যাওয়ার দৃশ্য প্রতিবেশীনিদের বুকে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। সে যেন বেঁচে থাকতে চায় সিনেমা নিয়ে কিন্তু বাস্তবে তার কোনদিনই সিনেমা দেখা হয় না। সিনেমা হলের সামনে পায়চারি করে, দেয়ালে লাগানো ছবিগুলো দেখে, হলের বাইরে থাকা অল্পদামের বইগুলো কিনে সিনেমা দেখে বেরিয়ে আসা মেয়েদের সঙ্গে গল্প করে সিনেমার গান, অভিনয়, বিষয়বস্তু জেনে প্রতিবেশিনীদের সামনে গর্ব করে নিরুপমার দিনের পর দিন কাটতে থাকে। আসলে নিরুপমা সিনেমা না দেখে টাকা জমিয়ে রাখে নিজের সন্তানের জন্য। কিন্তু তার আট বছরের বিবাহিত জীবনে যে এখনও এল না, সে আর কোনদিন আসবে কী? নিরুপমার জীবনের এমনই এক ট্র্যাজিক পরিণতিতে গল্পের সমাপ্তি ঘটে।

প্রসঙ্গক্রমেই মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের 'সাধারণ মেয়ে' কবিতার কথা। 'সাধারণ মেয়ে' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সাধারণ মেয়ের যে যন্ত্রণাকে ফুটিয়ে তুলেছেন তা হল, মেয়েটির জীবনে প্রেম ছিল, মেয়েটিও স্বপ্ন দেখেছিল উঁচু ক্লাসে পড়াশোনা করার, বিলেতের মেয়েদেরকে হারিয়ে

দেওয়ার—কিন্তু প্রেমিক মেয়েটির প্রেমের কোন মূল্যই দেয়নি। কিন্তু রমাপদ চৌধুরীর 'আমি একটি সাধারণ মেয়ে' গল্পের সাধারণ মেয়ে কোন স্বপ্ন দেখে না। লেখক তার সাধারণ জীবনের অতি সাধারণ যন্ত্রণাটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন সুনিপুণভাবে। গল্পটি শুরু হয়েছে এভাবে—

> ''আমি একটি সাধারণ মেয়ে। সাধারণ মেয়েদের মতোই সারাজীবন আমার কেটেছে শুধু স্বপ্ন দেখে। সাধারণ ঘরে আমার জন্ম। স্বাস্থ্য অটুট ছিল না কোনওকালেই, দেখতে সুন্দরী ছিলাম, 'পাত্রপাত্রী' কলমের ভাষায় মধ্যমশিক্ষিতা। তবু আমি স্বপ্ন দেখতাম সুখের, স্বাচ্ছন্দ্যের।"[৫৫]

বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে মেয়েটিকে সকলের মন জুগিয়ে চলতে হয়, ক্রমশ সংসারের কাজকর্মের চাপে তার রঙ ম্লান হয়ে যায়, রোগা হয়ে যায়, সেজন্যই স্বামীর কাছে নিজেকে ভাল দেখানোর জন্য নিজেকে সাজিয়ে তোলে—

> ''... আয়নায় একদিন দেখলাম, বিশ্রী রোগা হয়ে গেছি, চোখ বসে গেছে, রঙও আমার এতটা কালো ছিল না তো। কিন্তু কি বোকা আমি, পাছে এই চেহারা স্বামী দেখতে পায়, তাই পাউডার মেখে, সেজেগুজে এমন একটা ভাব করতাম যেন আমি যা ছিলাম তাই আছি।"[৫৬]

কিন্তু বাবার বাড়িতে এসে সেই মেয়েটিই তার বৌদির দিকে তাকায় না, তাকে এতটুকু সাহায্যও করে না। যদিও সে বোঝে বৌদির রঙ ম্লান হয়ে গেছে, অনুভব করে বৌদির দুঃখ কষ্ট, কারণ সেও তো একই পথযাত্রী। সে নিরুপায়, কেননা— ''একটু বিশ্রাম না নিলে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে আবার কাঁধে জোয়াল নেবো কি করে।"[৫৭] শ্বশুরবাড়িতে নিজের ভূমিকা এবং বাবার বাড়িতে বৌদির ভূমিকার মধ্যে এতটুকু ফারাক নেই। এই অতি সাধারণ সত্যটুকু উপলব্ধি করার সামর্থ থাকলেও তা যেন হারিয়ে ফেলেছে— ''ভেবে দেখব কি করে, তখন যে আমি সাধারণ মেয়ের মতোই আর একটি সাধারণ স্বপ্ন দেখছি। যা সবাই দেখে।"[৫৮]

।।চার।।

রমাপদ চৌধুরীর নারীপ্রধান গল্পগুলির অন্যতম আরেকটি গল্প হচ্ছে 'আমি, আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া।' গল্পটি ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে 'জলসা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে ১৩৬৬ সালে 'মুক্তবন্ধ' গল্পগ্রন্থে প্রকাশিত হয়। এই গল্পের কথক 'আমি' একজন নারী। মধ্যবিত্ত মানসিকতার ভয়াবহ পরিবর্তনের রূপ 'আমি, আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া।' সদ্য বিবাহিত একটি মেয়ে মধুচন্দ্রিমা যাপনের জন্য পুরীতে এসেছে—এই প্রেক্ষণবিন্দু থেকে তারই কথনে বর্ণিত হয়েছে গল্পটি। সমুদ্রে স্নানরত নর নারীর উচ্ছ্বল আনন্দোচ্ছ্বাস দেখে কথক 'আমি' ও তার স্বামী স্নান করতে সমুদ্রে যায়। সদ্য বিয়ের পর স্ত্রীর চোখে নিজের ইমেজ বাড়িয়ে তোলার জন্য নুলিয়াকে সঙ্গে না নিয়েই কথক 'আমি'-র স্বামী সমুদ্রে স্নান করতে যায়। একা সমুদ্রে স্নান করার সময় স্বামী ডুবতে বসলে অশ্রুসজল চোখে মেয়েটি একটি নুলিয়াকে নিজের হাতের বালা জোড়া দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্বামীকে বাঁচানোর কাতর অনুরোধ জানায়। নুলিয়াটি স্বামীকে বাঁচিয়ে তোলে ঠিকই, বিনিময়ে কিছুই চায় না কিন্তু ঝোঁকের বশে দেওয়া বালাজোড়ার প্রতিশ্রুতি সৃষ্টি করে নতুন সমস্যা। বালা জোড়া না দেওয়ার পেছনে কথকের যুক্তি হল বালা জোড়া যা দু'গাছি চুড়িও তা এই নুলিয়াটির কাছে। বালা দিলে মা ও বড়ো জা বকবে। শত অনটন সত্ত্বেও গয়নাকে হাতছাড়া করতে নেই, দিদির শেখানো যুক্তি। অতএব চুড়িটিও দেওয়া যাবে না। চুড়ির বদলে আংটি। শেষপর্যন্ত শুধুমাত্র একটি টাকাই দিয়েছে স্বামীকে বাঁচানোর বকশিস হিসেবে। এর পেছনেও কথকের অকাট্য যুক্তি, নুলিয়ারা টাকা পায় সরকারের কাছ থেকে। এখানেই শুরু হয় অপরাধ বোধের পালা এবং বিপক্ষ যুক্তি খাড়া—

> ''সত্যিই কি বালা দুটো দেব বলেছিলাম নুলিয়াটাকে? বোধ হয় না। সে সময় আমার কি মাথার ঠিক ছিল? কি বলেছি কি করেছি তা কি আর আমিই জানি! না, বালা-টালার কথা নিশ্চয়ই বলিনি। তা ছাড়া আমার বলা কওয়ার জন্যে কি অপেক্ষা করে ছিল নাকি

নুলিয়াটা? কখনো না। আমি বলার আগেই হয়তো নুলিয়াটা দেখতে পেয়েছিল। দেখতে পেয়েই সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কেউ ডুবে গেলে তাকে বাঁচানো তো ওদের কাজ।"[৫৯]

বলাবাহুল্য, উপন্যাসের মতো ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও রমাপদ-র আগ্রহের কেন্দ্রস্থল হল মধ্যবিত্ত জীবন। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক প্রসূন ঘোষ বলেছেন—

"বাংলা গল্পে মধ্যবিত্ত জীবনযাত্রার প্রাধান্য, তার কারণ লেখকরা প্রায় সকলেই মধ্যবিত্ত। যদিও কেউ কেউ সাময়িকভাবে এই জীবন থেকে অন্য জীবনকে উপলব্ধি করতে প্রয়াসী হয়েছেন। রমাপদ এমনই একজন লেখক। যদিও মধ্যবিত্ত মানুষের সীমাবদ্ধতাকে সুনিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।"[৬০]

রমাপদ চৌধুরীর বেশকিছু গল্প রয়েছে বস্তু নির্ভর। লেখকের দৃষ্টিতে এই বস্তুগুলো নিছক বস্তুরূপে আবদ্ধ নয়, এগুলি যেন মধ্যবিত্তেরই মিথ্যা আভিজাত্যবোধেরই প্রতীক। 'আজকের গল্প' -এধরনেরই একটি গল্প। গল্পটি সাপ্তাহিক 'দেশ'-এ 'একপাটি জুতো' নামে বেরিয়েছিল. ১৩৬৬ সালে 'মুক্তবন্ধ' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। গল্পটিতে দেখা যায় কথক পুজোর সপ্তমী দিনে তিন টাকা বারো আনা দিয়ে এক জোড়া জুতো কিনে আনেন মেয়ে বুলা-র জন্য। মেয়ে রাগ করে সেই জুতো জোড়ার একপাটি রাস্তায় ফেলে দেয় এর এরপর অনেক কষ্টে সন্ধান পাওয়া যায় গলির মোড়ের অনেকগুলি দেয়াল দোকানের একটিতে, তখন এই একপাটির দাম বারো আনা। একে কুড়িয়ে পাওয়া জুতো, তার ওপর কথক নিজে এটি না নিলে কেউ নেবে না, এর পরিপ্রেক্ষিতে দোকানদারের যুক্তি— "...আপনিই কিনবেন স্যার বারো আনা দিয়ে। তিন টাকা তো আপনার লাভ হবে।"[৬১] তাই কথক মধ্যবিত্ত নীতিবোধের তাগিদে অন্যায়ের প্রতিবাদস্বরূপ আরেক পাটি জুতো রাস্তায় ফেলে দিয়ে বলেন— "ছুঁড়ে ফেলে দিলাম বলব না, যেন ছুঁড়ে মারলাম। ওই অর্থলোভী দোকানীর উদ্দেশেই নয়, আজকের অর্থগৃধু সমাজের উদ্দেশে, আজকের ন্যায়নীতিবর্জিত মানুষের উদ্দেশে।"[৬২] কিন্তু মধ্যবিত্তের এই আদর্শ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। তাই গল্পের শেষে

লেখক দেখিয়েছেন—

> ''... জুতোটা ছুঁড়ে ফেলে দেবার পরক্ষণেই বোকামি বুঝতে পেরে নিজেই গিয়ে সেটা কুড়িয়ে এনেছিলাম এবং তারপর গলির মোড়ের দোকান থেকে বারো আনা দিয়ে হারানো এক পাটি জুতোকে উদ্ধার করে তিনটি টাকা বাঁচিয়েছিলাম। ন্যায়নীতির দম্ভ টেকেনি। কারণ আমিও তো আজকের মানুষ''[৬৩]

সেই একই ধরনের নৈতিক সংকটকে ঘিরে গড়ে ওঠে 'জাল' গল্পটি। এখানে ও কথক 'আমি' একজন সৎ ও নীতি পরায়ণ ব্যক্তি। অফিসে ঘোষ নেন না। অন্যায় সহ্য করেন না। ট্রামের টিকিট কাটা না হলে নামবার আগে কন্‌ডাক্টরকে ডেকে পয়সা দেন, বাজারে মাছওয়ালা ভুলবশত একটা টাকা বেশি দিলে খানিকটা রাস্তা এগিয়ে গিয়েও তার প্রাপ্য তাকে ফিরিয়ে দিয়ে আসেন। এ হেন মধ্যবিত্ত সৎ, নীতিবাগিশ ভদ্রলোকটি পুজোর বাজারে জিনিস ক্রয় করে টাকা দিতে গিয়ে হঠাৎই আবিষ্কার হয় তার দেওয়া টাকাগুলোর মধ্যে রয়েছে একটি জাল নোট। নোটটি যে জাল তা জানা না থাকায় তথাকথিত নীতিবাগিশ লোকটি রেগে যান। তার এই রাগ সততার, অহঙ্কারের। আসলে ব্যক্তিগত জীবনের চলমানতার সঙ্গে কোথাও কোথাও আদর্শবাদের ফারাক থেকে যায়। কিন্তু তার ব্যবহারিক জীবনে নীতি আদর্শ স্থায়ী হল কোথায়! কেননা আমরা দেখি আরেকটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ঢুকে ক্যাশিয়ারকে সহানুভূতি দেখিয়ে কৌশল করে জাল নোটখানা চালিয়ে দিতে। শুধু তাই নয়, এমন নীতিবাগিশ লোকটি আবার বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে জাল নোটটি চালনোর গল্প বলেন নির্দ্বিধায়।

'আলমারিটা' গল্পে সেই মধ্যবিত্তের চেহারা ফুটে ওঠে নতুন রূপরেখায়। গল্পটি ১৩৮০ সালে 'আমরা সবাই একসঙ্গে' গ্রন্থেপ্রকাশিত হয়। এই গল্পের কথক লোকটি অতিমাত্রায় ভদ্রলোক। শ্যালিকার ভাষ্যে, ''...ইস্ত্রি করা কথা বলা, ডাইং ক্লিনিং ফেরৎ ব্যবহার।''[৬৪] ছোটমামার রেখে যাওয়া দৈত্যের মতো চেহারার আলমারিটাকে নিয়ে এ গল্পের সমস্যা কেন্দ্রীভূত হয়। তথাকথিত ভদ্রতাবোধের দায়ে কথক এই আলমারিটাকে বাইরে ফেলতে পারছেন না আবার ঘরের মধ্যে

আধুনিক সরঞ্জামের বহরের মাঝখানে এই বিরাটকায় নক্‌শা করা আলমারিটা হয়ে গেছে বেমানান। বারান্দায় বের করে রেখেও কথক সর্বদা তটস্থ থাকেন যদি কোনদিন ছোটমামা এসে পড়েন বা কোন আত্মীয়স্বজন কিছু বলেন। আসলে মধ্যবিত্তের এই ভদ্রতাবোধ পুরোটাই বাইরের, ভেতরে থেকে যায় লোক দেখানো সৌজন্যবোধের অন্তর্দাহ। তাই আপিসের জয়ন্ত একদিন কথককে ঠাট্টা করে বলেছিল, ''আপনি অরুণদা রেগে গিয়ে কাউকে একদিন যদি 'শালা' বলতে পারেন, আপনাকে একটা কাটলেট খাওয়াব।''[৬৫] আর এখানেই কথকের স্বগতোক্তি এই মেকি ভদ্রতার খোলস ছেড়ে তার তীব্র অন্তর্দাহকে ফুটিয়ে তোলে, ''ভেতরটা তো দেখতে পাওনা, বিষফোঁড়া হয়ে আছে, জ্বলছে, বাইরেই শুধু সৌজন্যবোধের মলম লাগানো থাকে।''[৬৬]

'জাল' গল্পের কথকের মতো এই গল্প কথকের ছেলে মন্টু বাসের টিকিট কাটা না হলে কন্ডাক্টরকে ডেকে ভাড়া দেওয়াটাই উচিত মনে করে। ছেলের এই ধরনের সততার ব্যবহারে কথক গর্ব অনুভব করেন—

> ''ভদ্রতার সঙ্গে সততার কোথাও একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তো নিশ্চয়ই আছে। তা না হলে সৌজন্যবোধ শুধুই একটা হিপোক্রিসি হয়ে দাঁড়ায়।''[৬৭]

কিন্তু পরক্ষণেই কথকের এই গর্ববোধ চূর্ণ হয়ে যায়, যখন ছেলে বলে— ''চোর যদি হতেই হয় বড় চোর হব, ... ছিঁচকে চোর হব না।''[৬৮] 'সততা' শব্দের আভিধানিক অর্থ এখানে ঝাপসা হয়ে যায়। যে জায়গায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলা দরকার সেখানে তথাকথিত মধ্যবিত্ত মানসিকতা সম্পন্ন ভদ্রলোকেরা নিজেকে শুধু গুটিয়েই রাখে। গুটিয়ে রাখতে রাখতে সারাটা জীবন শুধু পালিয়েই বেড়ায়। সবসময় নিজের উপরে যেন কোন আঁচ না লাগে সে দিকেই তটস্থ। এ গল্প কথকও তার ব্যতিক্রম নন। যেমন ডাইং ক্লিনিং থেকে কাপড়গুলো নিয়ে এসে বিছানায় রাখলেই তাতে ময়লা লাগে, ইস্ত্রি নষ্ট হয়। শ্যালিকার ভাষায়,

> ''যা নোংরা নোংরা বাতিক ভদ্দরলোকটির, বাইরে বেরোলেই গায়ে ময়লা লাগে, ওঁকেও আলমারিতে চাবি বন্ধ করে রাখলে পারিস।''[৬৯]

আসলে সমস্যার পরিধি আরও বিস্তৃত হতে থাকে, 'ব্রহ্মদৈত্যি'র মতো আলমারিটা ঘিরে। যার জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় স্টিল আলমারি কেনা যায় না, যা কি না ঘরের একটি বৃহৎ জায়গা জুড়ে আছে, যার জন্য কথককে প্রতিমুহূর্ত ঠাট্টা বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়, অপ্রস্তুত হতে হয়। অফিসের জয়ন্ত একদিন বেড়াতে এসে ঠাট্টা করে বলেছিল—

> "... একেবারে মিউজিয়াম করে রেখেছেন অরুণদা। ... নকশার বাহার আছে কিন্তু। চারদিকে চারটে সাপ প্যাঁচ মেরে মেরে ফণা তুলেছে, কি ইমাজিনেশন। আর তিনটে ফণা থাকলেই সপ্ত শির, দিব্যি, শ্রীবিষ্ণু হয়ে শুয়ে পড়তে পারতেন ওর ওপর।"[৭০]

আলমারিটার নক্শা করা চার চারটে মাপের ফণার মতো ঠাট্টা-বিদ্রূপ, পরিহাসের ফণা কথকের চারপাশকে ঘিরে রেখেছে।

ভদ্রতা ও অভদ্রতার লড়াইয়ে কথক একদিন আবিষ্কার করলেন, যে ভদ্রতার সীমানা অতিক্রম করে কাউকে 'শালা' বললে যে তাকে কাটলেট খাওয়াবে বলে, কথক ততোধিক ভদ্রভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ বাস কন্ডাক্টরের সামনে এক টাকার নোট দুখানা কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেললে সেই ব্যক্তিটি গোটা ব্যাপারটার নাম করণ করেন 'সীন ক্রিয়েট'। বস্তুত ভদ্রতা ও অভদ্রতা মানুষের সুযোগ মাফিক গড়ে ওঠে। সমস্ত সামাজিক, পারিবারিক মানসিক সম্পর্কগুলোও পারস্পরিক সুবিধার্থের মূল্যের মাপকাঠিতে নির্ধারিত হয়। প্রসঙ্গত মনে পড়ে যায় বিনয় ঘোষের একটি মন্তব্য—

> "... মার্কেটে যেমন দ্রব্যমূল্যের তালিকা থাকে, বর্তমান সমাজের মার্কেটেও বহুবিধ মনুষ্যের মূল্যতালিকা সর্বদাই তেমনি লটকানো থাকে।"[৭১]

এখানেও দেখা যায় আলমারিটা তালাবন্ধ থাকায় যেহেতু কোন কাজে আসছে না সেহেতু সমস্ত মানবিক ভাবনা জলাঞ্জলি দিয়ে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ছোটমামার ব্রহ্মদৈত্যির মতো আলমারিটার স্থান পরিবর্তন হয় ঘর থেকে বারান্দায়। এই স্থান পরিবর্তনই বুঝিয়ে দেয় সময়ের পরিবর্তন। সময়ের

প্রবহমানতায় পুরাতনকে দূরে রেখে নতুনের আগমন ঘটা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি আধুনিক যন্ত্রসভ্যতা যে মানুষের মানবিক সম্পর্কগুলোকে শিথিল করেছে সেটাও যেন এক অনিবার্য অভিসম্পাত হয়ে দাঁড়ায়। নক্শা করা আলমারির জায়গায় 'সুদিং' একবারে চাঁচাছোলা খাট, চেয়ার, ড্রেসিং টেবিলের মতো ছোটমামা ও গল্প কথকের সম্পর্কের ভাঁটায় যে টান পড়বে, এটা যেন প্রত্যাশিত—

> ''ভদ্রতা জিনিসটাকে আমিও এখন বারান্দায় সরিয়ে দিয়েছি। কোনদিন হয়তো সেখান থেকে রাস্তায় বের করে দেব। ...সকলেই হয়তো বলতে চাইছে আমি এ পৃথিবীর যোগ্য নই, অথচ আমি যে ভেতরে ভেতরে এ সমাজের, এ কালের উপযুক্ত হয়ে উঠতে চাইছিলাম।''[৭২]

আর তাই গল্প শেষে ছোটমামার চিঠিতে লেখা সেই দুটি লাইন কথককে অসহায় করে তোলে—

> ''... সোমবারে গিয়ে দলিলগুলো নিয়ে আসবো। আলমারিটা তুই নিয়ে নিস, রাখিস যত্ন করে। মেহগনি কাঠের তৈরি, অনেক খরচ হয়েছিল।''[৭৩]

উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া মূল্যবান আলমারিটা যেন কথকের বুকের ওপর শালীনভাবে চেপে বসে।

প্রসঙ্গত মনে পড়ে যায় রমাপদ চৌধুরীর 'বসবার ঘর' গল্পের কথা। ১৩৮০ সালে 'আমরা সবাই একসঙ্গে' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। গল্পটিতে লক্ষ করা যায় যে বাড়িতে আলাদা করে বসার ঘরের অভাবে পরিবারের লোকেরা সবসময় অস্বস্তিবোধ করে। হঠাৎ কেউ এসে গেলে এ বাড়িতে তা হয়ে ওঠে 'কেলেঙ্কারিয়াস' ব্যাপার। ঝটিতি বিছানার চাদর থেকে শুরু করে, বাড়ির মেয়েদের শাড়ি পাল্টানো ও ঘর ঝাঁট দিয়ে দৈন্যতাকে গোপন করার আপ্রাণ প্রয়াস ফুটে ওঠে এ গল্পে। প্রসঙ্গত মনে পড়ে যায় রমাপদ চৌধুরীর 'লজ্জা' উপন্যাসটির কথা। এক মানসিক ভারসাম্যহীন বিবাহিত শ্বশুরবাড়ি ফেরত একটি মেয়ের মস্তিষ্ক বিকৃতিকে গোপন করার এক মধ্যবিত্ত পরিবারের

প্রাণান্তকর প্রয়াস। উপন্যাসের প্রসঙ্গকথায় লেখক নিজেই তা উল্লেখ করেছেন—

> ''আসলে মধ্যবিত্ত মানুষের সমস্ত জীবনটাই যেন সব কিছু গোপন করার চেষ্টায় অতিবাহিত হয়। তার অভাব অনটনই শুধু যে গোপন করে না। গোপন করতে চরম দুঃখকেও।''[৭৪]

এ গল্পেও কিন্তু তার ব্যতিক্রম ঘটে না। 'বসবার ঘর' না থাকাটা কথক ও তার পরিবারের কাছে চরম লজ্জা ও হীনমন্যতার কারণ হয়। এরজন্য কুমকুমকে কলেজের বন্ধুদের কাছে হতে হয় 'আন্‌সোস্যাল', আটবছরের টুটুকেও হতে হয় লজ্জিত। কালক্রমে 'বসবার ঘর'-এর শাব্দিক পরিবর্তন হচ্ছে 'সিটিং রুমে'। সেখানে কথক নিজের ঘরের বর্ণনা দিচ্ছেন এভাবে—

> ''ঘর তো নয়, এক একখানা গোডাউন। কাঠের বেঞ্চির ওপর সারি সারি তোরঙ্গ একটার ওপর একটা, ওপাশে লেপ তোশক স্তূপীকৃত করা আছে, খাট আলমারি, খাটের নীচে থেকে বিয়ের সময় পাওয়া গামলা কলসী হাঁড়ি ইত্যাদি উঁকি দিচ্ছে, ওপাশে আলনা—যেটুকু দেয়াল দেখা যাবার কথা, তাও সতেরোটা ক্যালেন্ডারে চালচিত্তির হয়ে আছে।''[৭৫]

এ হেন মান্ধাতা আমলের ঘরখানাকে নিয়ে গোটা পরিবারের বিরক্তির সীমা নেই। এই মধ্যবিত্তরা আসলে কোন একটা অভাবকে চাপা দিয়ে ক্রমশ নিজেদের পরিধিকে সীমাবদ্ধ করে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। এ গল্পের কথকেরও তাই মনে হয়—

> ''... শুধু একটা বসবার ঘরের অভাবে ক্রমশ যেন নিজেদের গুটিয়ে ফেলছি; সকলকে দূরে সরিয়ে দিয়ে খোলসের মধ্যে ঢুকে পড়তে চাইছি।''[৭৬]

গল্পের পরিণতিতে দেখা যায়, শ্যাওলা ধরা জীর্ণ চেহারার বাড়িতে বসবার ঘর নেই। যে কারণেই, কথকের এবং কথক স্ত্রী রেখা অলক ও উমার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেন। এই বসবার ঘর না থাকাটাই যেন দুটি পরিবারের একাত্মতার পরিচায়ক হয়ে ওঠে।

মধ্যবিত্তের মিথ্যা আভিজাত্যবোধের আরেকটি অবয়ব ধরা পড়ে 'ফ্রীজ' গল্পে। গল্পটি 'যদিও সন্ধ্যা' গ্রন্থে ১৩৭৩ সালে প্রকাশিত হয়। এই গল্পেও দেখা যায় সময়ের সঙ্গে বা আরেকটু স্পষ্ট করে বলা যায় সমশ্রেণিভুক্ত অন্যদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার প্রবণতা। যেখানে একজনের রেডিওগ্রাম এলে অন্যজনেরও তা প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। কখনো ছেলের আবদারে, কখনো স্ত্রীর অনুরোধে বা জবরদস্তিতে, কখনো বা দোতলার বাসিন্দাদের দেখাদেখি সময়োপযোগী আসবাবে ক্রমশ ভরে ওঠে কথক 'আমি'র ঘর। এরপর সময়ের দাবি মেনেই তক্তপোশকে বিদায় দিয়ে আসে ইংলিশ ঘাট, রেডিওর পরিবর্তে আসে রেডিওগ্রাম এবং সবশেষে ফ্রীজ। কিন্তু বোনাসের টাকায় ফ্রীজ কেনা হলেও বিধবা মেজদিকে কুড়িটি টাকা অর্থ সাহায্যের সময় দেখা দেয় অর্থাভাব। এক গোপন অপরাধবোধ আমিকে 'দহন' করে, হয়তো সেজন্যেই ঘুমের ঘোরে, রাতের আবছায়ায় সাদা ফ্রিজটাকে কেবলই মেজদির সাদা থান মনে করে ভুল করেন গল্প কথক।

এরকমই বস্তুনির্ভর আরেকটি গল্প হচ্ছে 'ডাইনিং টেব্‌ল'। গল্পটি 'আমরা সবাই একসঙ্গে' গ্রন্থে ১৩৮০ সালে প্রকাশিত হয়। ছোটো দুটি ছেলে -মেয়ে, স্ত্রী এবং কয়েকদিনের জন্য থাকতে আসা ভাগ্নীকে নিয়ে কথক 'আমি'-র সংসার। এখানেও 'বসবার ঘর' গল্পের মতো মধ্যবিত্তের সেই সমস্যা ঘুরে ফিরে আসে, যেখানে একটি ডাইনিং টেব্‌ল না থাকলে বাড়িতে কাউকে নেমন্তন্ন করা যায় না বা সেইটির অভাবে কারো কাছে আসা যায় না। একদিকে টাকার অভাবে ডাইনিং টেব্‌ল কেনা সম্ভব হচ্ছে না, অন্যদিকে দীর্ঘদিনের বনেদিয়ানার শখ— এই দু'য়ের টানাপোড়েনে শেষপর্যন্ত ডাইনিং টেব্‌ল কেনা হলেও পরবর্তীতে তাই হয়ে ওঠে বোঝা। ঘর আসবাব দেখানোর শো-কেসে পরিণত হয়। কথক 'আমি'র বয়ানে—

> ''ডাইনিং টেব্‌লটা কোনও উপরি আনন্দ তো দিলই না, ঘরগুলোও এখন আসবাবে ঠাসা। খাট, আলমারি বাক্স-বিছানা, ড্রেসিং টেব্‌ল, পড়ার টেব্‌ল... দুখানা তো ছোট ছোট ঘর... নড়াচড়ার উপায় নেই। ঘর যেন আমাদের জন্যে নয়, আমাদের আসবাব পত্র দেখানোর শো-কেস শুধু।''[৭৭]

আর তাই ক্রমশ সঙ্কোচিত হয়ে যায় বসবার জায়গা, শেষপর্যন্ত ডাইনিং টেব্‌লটাই সমস্ত জায়গা নিয়ে নেয়।

মধ্যবিত্তের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির বিরোধিতার কাহিনি হয়ে ওঠে 'ড্রেসিং টেব্‌ল' গল্পটি। গল্পটি ১৩৮০ সালে প্রকাশিত হয় 'আমরা সবাই একসঙ্গে' গ্রন্থে। গল্পের কথক 'আমি একজন নারী। নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের সুন্দরী মেয়ে কথক 'আমি'-র ছোটবেলা থেকেই একটি ড্রেসিং টেব্‌লের শখ ছিল। আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে এই শখ তার পূরণ হয় না। এই স্বপ্ন পূরণ না হওয়ার জন্য একদিকে যেমন দরিদ্রতাকে দায়ী করে অন্যদিকে বাবার অনিচ্ছাকেও বড় করে দেখে কথক 'আমি'—

> ''... দূর, গরিব না ছাই, বাবার কাছে সবই শুধু শৌখিনতা। যেন শৌখিন হওয়াটা খারাপ। তাই, একটা বড় আয়নাও ছিল না বাড়িতে। ... দেয়ালে টাঙানো কাঠের ফ্রেমের ছোট্ট আয়নাতেই মুখ দেখে শখ মেটাতে হয়েছিল।''[৭৮]

বড়ো হয়ে বন্ধুর বিয়ের দানসামগ্রী দেখে কথক 'আমি'-র শখ যেন আরও বেড়ে যায়—

> ''... বিয়ের সময় একটা ড্রেসিং টেব্‌ল দিতে বলব বাবাকে। ... গদিমোড়া টুলে বসে আয়নার সামনে সাজব, টিপ, লিপস্টিক, স্নো, ক্রীম সব টুকিটাকি সাজানো থাকবে সেখানে...''[৭৯]

যদিও নিজের বিয়েতে অভাবগ্রস্থ বাবা সেই শখ পূরণ করতে পারেননি। ধীরে ধীরে শুরু হয় প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির সংঘাত। বিয়ের পর প্রথম প্রথম লজ্জায় স্বামীর কাছে এই ছোট্ট প্রত্যাশার কথা বলতে পারেনি। চিকেন পক্স সেরে যাবার পর যেমন ফর্সা গায়ে দাগ পড়ে তেমনি দাগযুক্ত মাঝারি সাইজের একটি আয়না যদিও বা শ্বশুরবাড়িতে ছিল তাও বড়ো জায়ের ঘরে। শত অভাব-অনটনের মাঝে এই মেয়েটি শখ মেটানোর জন্য সংগৃহীত অর্থ জমা করলে হঠাৎ সে আবিষ্কার করে, যে রূপাবয়ব প্রত্যক্ষ করার জন্য এই স্বপ্নপূরণের আপ্রাণ চেষ্টা, ততদিনে হতশ্রী রূপ ধারণ করেছে। আর তাই কথক স্বামীর স্পষ্ট উচ্চারণে এক লহমায় ভেঙে চুরমার হয়ে যায় নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের

বিগত যৌবনা হতশ্রী গৃহবধূর প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির স্বপ্ন। এখানেই গল্পটির চরম ট্র্যাজিক পরিণতি লক্ষ করা যায়।

।।পাঁচ।।

রমাপদ চৌধুরীর লেখা 'চাবি', 'আপট্রেন', 'বড়বাজার' এই তিনটি গল্পের সঙ্গে 'আলমারিটা', 'ফ্রীজ', 'বসবার ঘর' গল্পগুলির দিক থেকে মিল খোঁজে পাওয়া যায়। বাজার সর্বস্ব মানসিকতার কাছে আধুনিক মধ্যবিত্ত জীবনের মানবিক সম্পর্কবোধের পরাজয়। অবশ্য প্রতিটি গল্পে অনেক বিষয়ে মিল থাকলেও গল্পগুলির গতি প্রকৃতি স্বতন্ত্রতায় পূর্ণ। গতিশীল সময়ের এই স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করি রমাপদ চৌধুরীর 'চাবি' গল্পে। 'চাবি' গল্পের মূল বিষয় হচ্ছে যাওয়া, যদিও গন্তব্য একেবারেই অনির্দিষ্ট। গল্পটির সূচনা হয় এক অস্পষ্টতার মধ্য দিয়ে। কথক 'আমি'-র বয়ানে—

> ''আমার যেন কোথায় যাওয়ার কথা ছিল। আমার হঠাৎ মনে হলো কোথায় যেন যেতে হবে। কোথায়, আমার মনে পড়লো না।''[৮০]

ঘুমের মধ্যে না কি ঘুম থেকে জেগে ওঠে না ঘুমের মধ্যে জেগে ওঠে কথক 'আমি' আবিষ্কার করেন একটি চাবির গোছা যার মধ্যে রয়েছে পাঁচ সাতটা নানা আকারের চাবি। সেই চাবি দিয়ে কথক খোলেন গোডরজের আলমারিটা, আলমারির মধ্যে থাকা দেরাজে মেলে আরো কিছু চাবির সন্ধান। হয়তো চাবিগুলো অকেজো, হয়তো বা এগুলো দিয়ে খোলা যায় কোন সুটকেস, ট্রাঙ্ক কিংবা দরজা—বিস্মৃতির অন্তরালে জীবন স্মৃতির গূঢ় রহস্য সন্ধান। তালা খোলা 'আমি'-র লক্ষ্য নয়। সে কোথাও পৌঁছতে চায়, তাই শুধুই তার মনে হয়—

> ''দেরি হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি আমি জামাকাপড় বদলে নিলাম। টাকার ব্যাগটা পকেটে নিয়ে... খানকয়েক ধূতি পাঞ্জাবি ভরে নিলাম স্যুটকেসে। তারপর দ্রুত আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। কেবলই মনে হতে লাগল দেরি হয়ে যাবে। আমি

স্টেশনে এসে পৌঁছলাম। কি করে... আমার মনে পড়ল না।"[৮১]

তাই ট্রেনে জনৈক সহযাত্রীর 'বাড়ি যাচ্ছি' শুনে কথকের মনে হয় বাড়িতে তো যাওয়া যায় না, ফিরে আসা হয়। কারণ বাড়ি কারোর গন্তব্য হতে পারে না। ট্রেন এগিয়ে চলে নিজস্ব গতিতে আর কথকের মনে পড়ে যায় সেই চাবির গোছাটা তাকে পৌঁছে দিতে হবে যে করেই হোক, যদিও কোথায় পৌঁছতে হবে সেটা জানা না থাকলেও চাবির গোছাটা তখন আর খোঁজে পাওয়া যায়নি। 'আমি'-র কাছে যাওয়ার কোন অর্থই থাকে না, সে জন্যই ট্রেন যত দ্রুতবেগে সামনের দিকে এগোতে থাকে 'আমি'-র অন্তঃকরণও ততোধিক দ্রুততায় পেছনের দিকে ধাবিত হয়। আসলে গল্পটিতে চাবি হয়ে ওঠে অতীত ও ভবিষ্যতের মেলবন্ধনের প্রতীক।

'চাবি' গল্পের মতো 'আপট্রেন' গল্পেরও মূল থীম হচ্ছে যাওয়া। গল্পের কথক 'আমি' চারপাশের নোংরা রাজনীতির প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে ভাবেন, যাবতীয় সংকীর্ণতা, বাধা অতিক্রম করে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াবেন। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হয় না। তাই একদিন নিজের চাকরির উমেদারির জন্য তথাকথিত প্রভাবশালী ব্যক্তির অমূল্য জীবন কাহিনি শুনতে গিয়ে কথক অনুভব করেন নিজের অজান্তেই মেরুদণ্ডটা বেঁকে গেছে—

> "... ভেবেছি মেরুদণ্ডটা সোজা করে আমি দাঁড়াব, আর একটার পর একটা ওইসব বাঁধাবাঁধির যত কূটগ্রন্থি খুলে ফেলব, ছিঁড়ে ফেলব। কিন্তু তারপর কেমনভাবে যেন এই ভদ্রলোকের কাছে এসে পৌঁছেছি, আর একটুও লজ্জা করছে না এখন আমার মেরুদণ্ড বিনয়ে কিংবা তোষামদে এতখানি বেঁকে গেছে বলে। ... ওঁর অমূল্য জীবনের কথা শোনার আগ্রহ দেখাতে গিয়ে আমি কেমন ঝুঁকে পড়েছি। খেয়াল নেই যে, মেরুদণ্ডটা বেঁকে গেছে।"[৮২]

এরপর একটি আপট্রেনে ওঠার তাগিদেই কথকের যাত্রা শুরু এবং গল্পেটিও একটি অনিবার্য পরিণতির দিকে এগিয়ে চলছে, যে এগোনোর একটি বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে ট্রেনের যাত্রীদের

অমানবিক আচরণ, হট্টগোল, হুড়াহুড়ি, চীৎকার—সামান্য একটু বসার জায়গার জন্য অভব্য আচরণ। কথক 'আমি'-ও এর একজন নির্বিকার অংশীদার। গল্পের 'আমি'-র অনুসন্ধান বা বলা যায় অন্বেষণ ক্রমশ এগিয়ে চলে এভাবে— প্রথমে দাঁড়ানোর উপযোগী জায়গা, বসার জায়গা, পাখার হাওয়ার নীচে বসার আসন এবং সবশেষে কামরার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আসন জানালার পাশের সীট। এসমস্ত কিছু করার পেছনে 'আমি' বিসর্জন দেয় যাবতীয় সভ্যতা, ভদ্রতা। আর সেজন্যেই—

> ''আমরা মশাই কেউই হোমা স্যাপিয়ন নই, যতই খাড়া হয়ে দাঁড়ান, মাথা উঁচু করুন... ভেতরে ভেতরে আমরা তো প্রতি মুহূর্ত চতুষ্পদ হয়ে যাই, কখনো কখনো সরীসৃপ।''[৮৩]

যদিও পরক্ষণেই কথক অনুভব করেন তিনি একা, শূন্য, চারদিকে শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। আসলে বর্তমানে জাগতিক ইঁদুর দৌড়ের পরিসরে মানুষ তার পারিপার্শ্বিককে দুমড়ে মুচড়ে উপরে উঠার তাগিদে যাবতীয় মানবিকতাকে বিসর্জন দিয়ে নিজের অগোচরেই নিঃসঙ্গী হয়ে যায়, বুঝতে পারে না। এ গল্পের কথকও জানালার পাশের আসনটিতে পৌঁছে গিয়ে অনুভব করেন কামরার প্রত্যেকটি মানুষকে তিনি হারিয়ে ফেলেছেন, তার প্রতি কারো সহানুভূতি বা সমবেদনা নেই। পরাবাস্তবতার মধ্য দিয়ে গল্পটি বর্ণিত হলেও এরমধ্যে চলমান সময়ের বাস্তব রূপটিই লেখক তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞানে ফুটিয়ে তুলেছেন, একথা বলাই বাহুল্য মাত্র।

'চাবি' ও 'আপট্রেন' গল্পের 'যাওয়া'র মতো 'বড়বাজার গল্পের মূল মোটিফ 'চাওয়া'। তবে এই 'চাওয়া' খুবই দ্রুতগতি সম্পন্ন। গল্পটির সূচনা হয় পরাবাস্তবতার মধ্যদিয়ে। বাইরে অঝোরে আলকাতরার মতো বৃষ্টি পড়ছে, তারই মধ্যে ছায়ার মতো লোকটি তিনটি টাকা টেবিলে রেখে চলে যায়। গল্প কথকের 'অন্য কি যেন চাই' বলে টাকা তিনটি নিঝুম অন্ধকারে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেন, ক্রমশ এগুলি তিনটি শূন্য থেকে তিনটি ম্যানহোলে পরিণত হয়। পণ্যমুগ্ধ আকাঙ্ক্ষার টানে কথক এসে পৌঁছান আলোয় আলোকিত এক সুপারমার্কেটে। সেখানে 'আমি' কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, অনুভব করতে পারছে না। কারণ—

> ''আমি অন্ধকারে এতক্ষণ কিছুই দেখতে পাইনি, কারণ সেখানে

একটুও আলো ছিল না, এখন আমি আলোয় অন্ধ হয়ে গেলাম,
কারণ সেখানে একটুও অন্ধকার ছিল না।”[৮৪]

চাওয়ার তাগিদ এতটাই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে শো-কেসের কাঁচ ভেঙে ভেতরে ঢুকে কথক আবিষ্কার করলেন সেখানে কিছু চাওয়া যায় না, যথার্থ মূল্যের বিনিনময়ে তা কিনতে হয়। এরপরই শুরু হয় কথক ‘আমি’র কেনার পালা—ডান হাতে বদলে পাউরুটি, বাঁ হাতের বদলে অন্যান্য খাবার, মগজের অর্ধেকের বিনিময়ে ভালো ভালো পোশাক, দু’খানা পায়ের বদলে চেয়ার সঙ্গে ফাউ হিসাবে একটা খাট ও আলমারি, আরও আধখানা মগজের বিনিময়ে নারীদেহর বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। এভাবেই কথক ‘আমি’-র শক্তি, বিবেক, বুদ্ধি, কল্পনা, যুক্তি, সত্যদৃষ্টি, শরীর সমস্ত কিছুই বিকিয়ে যায় ভোগ্য সামগ্রীর বিনিময়ে। একসময়ের ক্রেতাই হয়ে ওঠে বিক্রেতা। অবশেষে বড়বাজারের ম্যানহোলে পড়ে থাকে কেবল অকেজো হৃদপিণ্ড যা কেনার আগ্রহ কোন ক্রেতার থাকে না। আর এভাবেই স্নেহের অশ্রুজলে হৃদপিণ্ডের রক্তগোলাপ হয়ে ওঠা যেন সর্বগ্রাসী অন্ধকারের থেকে উত্তরণের ইঙ্গিত। সেজন্যেই গল্পের সমাপ্তিতে আসে অনিবার্য পুনশ্চ—

‘‘...আমি তো ঠিক জায়গাতেই এসে পৌঁছেছিলাম। আর তখন তো আমি একটা সম্পূর্ণ মানুষ ছিলাম, আমার সব কিছুই ছিল, দুটি সবল হাত, আর আমার মগজটাও তখন স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারত... তখন এই ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্স, এই সুপারমার্কেটটা আমি কেন দু’হাতে ভেঙে চুরমার করে দিলাম না। ... তা হলে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ নিজেকে বিক্রি করার জন্য ছুটে আসত না।”[৮৫]

পরাবাস্তবতার মধ্য দিয়ে রমাপদ একান্তভাবে নিজস্ব ধরনে আধুনিক জীবনের সংকটকে তুলে ধরেছেন।

রমাপদ চৌধুরীর লেখালেখির জগত মূলত মধ্যবিত্ত জীবনকেন্দ্রিক হলেও তার গল্পে অনায়াসে উঠে এসেছে আদিবাসী জীবনগাথা। আজীবন ভ্রমণপিপাসু লেখকের রচনা তাই

প্রতিনিয়ত করে চলে নতুন জীবন সন্ধান। তাই লেখকের গল্পের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে কখনো ইতিহাসনির্ভর, ইতিহাসচেতনাসমৃদ্ধ, নারীকেন্দ্রিক, বস্তুকেন্দ্রিক, মধ্যবিত্ত জীবন কেন্দ্রিক তাঁর ইতিহাস নির্ভর গল্প শুধু ইতিহাসের বিষয়বস্তুকে ব্যাখ্যায়িত করে না, তার মধ্য দিয়ে উঠে আসে আধুনিক জীবনের যন্ত্রণাদগ্ধ রূপরেখা। আদিবাসী জীবনকেন্দ্রিক রচনাগুলো যেন ইঙ্গিত করে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত জনজীবনের বর্বরতার চেহারা। নারীকেন্দ্রিক রচনাগুলি কখনো একক নারীসত্তার গল্প হয়ে ওঠেনি, একক থেকে সর্বজনীনতায় উত্তরণ ঘটেছে। মধ্যবিত্ত জীবন কেন্দ্রিক বস্তুনির্ভর গল্পগুলির নামকরণ লেখক বস্তুর নামানুসারে করলেও তার মধ্যেই তুলে ধরেছেন আধুনিক নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের চাওয়া-পাওয়া, আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশার চরম দ্বান্দ্বিক রূপ। তাঁর পরাবাস্তবতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়া গল্পগুলিও হয়ে উঠেছে মধ্যবিত্তের চাওয়া-পাওয়ার দ্বান্দ্বিক অবয়ব। তাই আলোচনার আপাত সমাপ্তিতে এসে আমরা বলতে পারি যে, রমাপদ আসলে অজস্র ছোটো বড়ো পরিসরের মধ্য দিয়ে মানুষের জটিল রহস্যময় মনের গভীরে ডুব দিয়েছেন এবং তুলে এনেছেন সমাজের বিচিত্র অংশের বিচিত্র মানুষ আর বৈচিত্র্যপূর্ণ পটভূমি। যা একান্তভাবেই লেখকের রচনা নৈপুণ্যে এক অনন্য মাত্র সংযোজন করেছে। যে সময়ে গল্পের সূচনা হচ্ছে, সেই সময় ও সামাজিক পরিসরের যেমন স্বাভাবিক সরব উপস্থিতি, তেমনি সময়োত্তীর্ণ সময় পরিসরের নীরব উপস্থিতি উপলব্ধি করা যায়। আর এভাবেই একান্ত নিজস্ব ধরনে সমকালকে ছুঁয়ে যান রমাপদ চৌধুরী।

সূত্র নির্দেশ :

১। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্যে ছোটগল্প, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম সংস্করণ শ্রাবণ ১৪০৫, পৃ. ২০২।

২। রমাপদ চৌধুরী, গল্পসমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, ২য় নতুন সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৬, পৃ. ৮৭২।

৩। তদেব, পৃ. ১।

৪। তদেব, পৃ. ৪।

৫। তদেব, পৃ. ৫।

৬। তদেব, পৃ. ৬।

৭। তদেব, পৃ. ১০।

৮। তদেব, পৃ. ৮।

৯। তদেব, পৃ. ৯।

১০। তদেব, পৃ. ৮৭৪।

১১। তদেব, পৃ. ১৯৫।

১২। তদেব, পৃ. ১৯৬।

১৩। শম্পা চৌধুরী, রমাপদ চৌধুরীর কথাশিল্প, এবং মুশায়েরা, জানুয়ারি ২০১০, ১ম প্রকাশ, পৃ. ৯৭।

১৪। রমাপদ চৌধুরী, গল্পসমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, ২য় নতুন সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৬, ২য় নতুন সংস্করণ, পৃ. ২৭০।

১৫। তদেব, পৃ. ২৭০।

১৬। তদেব, প. ২৭১ ।

১৭। তদেব, পৃ. ২৭৩।

১৮। তদেব, পৃ. ২৭৪।

১৯। তদেব, পৃ. ২৭৭।

২০। তদেব, পৃ. ২৭৮।

২১। তদেব, পৃ. ২৯৪।

২২। তদেব, পৃ. ২৮৯।

২৩। তদেব, পৃ. ২৯০।

২৪। তদেব, পৃ. ২৯২।

২৫। তদেব, পৃ. ২৯২।

২৬। তদেব, পৃ. ৭৯৪।

২৭। তদেব, পৃ. ৭৯৬।

২৮। তদেব, পৃ. ৭৯৬।

২৯। তদেব, পৃ. ৭৯৭ ।

৩০। তদেব, পৃ. ৭০৩ ।

৩১। তদেব, পৃ. ৪৪৫ ।

৩২। তদেব, পৃ. ৪৪৮।

৩৩। তদেব, পৃ. ৪৪৮ ।

৩৪। তদেব, পৃ. ৪৪৯ ।

৩৫। তদেব, পৃ. ৪৪৯ ।

৩৬। তদেব, পৃ. ৪৫০ ।

৩৭। রমাপদ চৌধুরী, উপন্যাস সমগ্র ২য় খণ্ড আনন্দ পাবলিশার্স, চতুর্থ মুদ্রণ পৌষ ১৪১৪, পৃ. ৪৬১।

৩৮। রমাপদ চৌধুরী, গল্প সমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, ২য় নতুন সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৬, পৃ. ৫৬৪।

৩৯। তদেব, পৃ. ৫৬৮ ।

৪০। তদেব, পৃ. ৫৬৭।

৪১। তদেব, পৃ. ৫৬৭।

৪২। তদেব, পৃ. ৫৬৭।

৪৩। তদেব, পৃ. ৫৬৯ ।

৪৪। তদেব, পৃ. ৫৬৯ ।

৪৫। তদেব, পৃ. ৫৭০ ।

৪৬। গোপা দত্ত ভৌমিক, রমাপদ চৌধুরীর কৃষ্ণ ভারতবর্ষ, রমাপদ চৌধুরী সংখ্যা, একাদশ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা-১৪২০, উজাগর পৃ. ১২২, ১২৩।

৪৭। রমাপদ চৌধুরী, গল্প সমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, ২য় নতুন সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৬, পৃ. ৩৩০।

৪৮। তদেব, পৃ. ৩৭৬ ।

৪৯। তদেব, পৃ. ২৮০।

৫০। তদেব, পৃ. ২৮৩ ।

৫১। তদেব, পৃ. ৩৯৪ ।

৫২। তদেব, পৃ. ৩৯৭।

৫৩। তদেব, পৃ. ২৮৭।

৫৪। তদেব, পৃ. ২৮৭।

৫৫। তদেব, পৃ. ৩৭৪ ।

৫৬। তদেব, পৃ. ৩৭৫।

৫৭। তদেব, পৃ. ৩৭৬ ।

৫৮। তদেব, পৃ. ৩৭৬ ।

৫৯। তদেব, পৃ. ৪০৬ ।

৬০। সুবল সামন্ত (সম্পা), বাংলা গল্প ও গল্পকার, এবং মুশায়েরা, ৫ম খণ্ড, পৃ.৪৩।

৬১। রমাপদ চৌধুরী, গল্প সমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, নভেম্বর ২০০৬, ২য় নতুন সংস্করণ, পৃ. ৩৭৩।

৬২। তদেব, পৃ. ৩৭৩।

৬৩। তদেব, পৃ. ৩৭৩।

৬৪। তদেব, পৃ. ৫৫১।

৬৫। তদেব, পৃ. ৫৫২।

৬৬। তদেব, পৃ. ৫৫২।

৬৭। তদেব, পৃ. ৫৫২।

৬৮। তদেব, পৃ. ৫৫৩।

৬৯। তদেব, পৃ. ৫৫৩।

৭০। তদেব, পৃ. ৫৫৩।

৭১। বিনয় ঘোষ, বাংলা নবজাগৃতিক, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, প্রথম ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান মুদ্রণ ২০০৯, পৃ. ১৭।

৭২। রমাপদ চৌধুরী, গল্প সমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, নভেম্বর ২০০৬, ২য় নতুন সংস্করণ, পৃ. ৫৫৫।

৭৩। তদেব, পৃ. ৫৫৭।

৭৪। রমাপদ চৌধুরী, উপন্যাস সমগ্র ১ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০০৩, প্রসঙ্গকথা, পৃ. ৪৩৫।

৭৫। রমাপদ চৌধুরী, গল্প সমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, নভেম্বর ২০০৬, ২য় নতুন সংস্করণ, পৃ. ৫৪৬।

৭৬। তদেব, পৃ. ৫৪৭।

৭৭। তদেব, পৃ. ৫৯৫।

৭৮। তদেব, পৃ. ৫৯৬।

৭৯। তদেব, পৃ. ৫৯৭।

৮০। তদেব, পৃ. ৫৮৫।

৮১। তদেব, পৃ. ৫৮৭।

৮২। তদেব, পৃ. ৬৫২।

৮৩। তদেব, পৃ. ৬৫৮।

৮৪। তদেব, পৃ. ৬৩৮।

৮৫। তদেব, পৃ. ৬৪৩।